মুঘল ভারতে সঙ্গীত চিন্তা



রাজ্যেশ্বর মিত্র

মুঘল ভারতের সঙ্গীতচিন্তা

রাজ্যেশ্বর মিত্র

লেখক সমবায় সমিতি
কলিকাতা-২৬

প্রকাশক :
শ্রীজ্যোৎস্না সিংহরায়
লেখক সমবায় সমিতি
৭৩বি শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে রোড
কলিকাতা-২৬

প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৭১

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীশ্যামল চক্রবর্তী

পরিবেশক :
বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীমণীন্দ্রকুমার সরকার
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১।১ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মূল্য ৫'০০

ভূমিকা

সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস নিয়ে কিছু কিছু বস্তুনিষ্ঠ তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা-গবেষণা হয়েছে, ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় এবং ইংরাজিতে। সঙ্গীতশাস্ত্রের কিছু কিছু নতুন নতুন পুঁথিপত্রও আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত হয়েছে, যার ফলে অনেক নতুন তথ্য আমাদের গোচর হয়েছে। এই আলোচনা-গবেষণা-সম্পাদনার কাজ যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে দু' একজন ছাড়া আর কেউই সঙ্গীতশিল্পী নন; অনেকেই শুধু সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ, সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু সঙ্গীত এমন শিল্পকর্ম যাতে কিছুটা নৈপুণ্য অর্জন না করলে শাস্ত্রোক্ত পারিভাষিক শব্দ ও পদের সঙ্গত ও সম্যক্ অর্থ সর্বদা পরিষ্কার ধরা পড়ে না। এঁদের মধ্যে যাঁরা সঙ্গীতনিপুণ তাঁদেরও প্রবণতা সাধারণত সংস্কৃত ভাষায় রচিত সঙ্গীতগ্রন্থাদির দিকে; এই জাতীয় গ্রন্থগুলিই তাঁদের প্রধান আশ্রয়। এর কারণ সহজবোধ্য। সদ্যোক্ত আলোচক-গবেষকরা প্রায় সকলেই হিন্দু, এবং যাঁরা হিন্দু নন, তাঁরাও সংস্কৃতজ্ঞ ভারতবিদ্যাবিদ্। আমাদের মধ্যযুগীয় প্রধানত ফারসী ভাষাশ্রিত মুসলমানী সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ, সুলতানী ও মুঘল আমলে সম্রাট, রাজা, আমীর ওমরাহদের দরবারে সঙ্গীতের চর্চা হ'তো প্রচুর যার ফলে ভারতীয় সঙ্গীত নানা নতুন রাগ রাগিণী, নতুন তাল, নতুন নতুন মিশ্রণ, নতুন ঢঙ্, নতুন গায়কীর প্রবর্তনায় সুবিপুল সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। সেখানে সঙ্গীতচিন্তাও যে কিছু কিছু হ'তো, এবং সমসাময়িক হিন্দু ও মুসলমান সঙ্গীতশাস্ত্রীরা যে সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় তাঁদের কিছু কিছু চিন্তা ধরে রেখে গেছেন তার নিদর্শন একেবারে অজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত নয়। এই আমলের সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুঁথিগুলির কিছু কিছু সম্পাদিত ও আলোচিত হয়েছে, কিন্তু ফারসী ভাষার রচনাগুলির দিকে বর্তমান সঙ্গীতশাস্ত্রীদের দৃষ্টি সম্যক্ আকৃষ্ট হয়নি, এবং সেজন্য ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস রচনায় এই মূল্যবান উপাদানগুলির ব্যবহার প্রায় হয়নি বললেই চলে।

'মুঘল ভারতের সঙ্গীতচিন্তা' গ্রন্থটি প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রীদের এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনুসন্ধানীদের দৃষ্টি এদিকে

আকর্ষণ করা, এবং এই জাতীয় উপাদানগুলিকে সুষ্ঠু সম্পাদনা, সানুবাদ ও আলোচনার বিষয়ীভূত করে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলা। এই গ্রন্থটির রচয়িতা শ্রীযুক্ত রাজ্যেশ্বর মিত্র শুধু সার্থক সঙ্গীতশিল্পী নন, তিনি আমাদের একজন প্রধান সঙ্গীতশাস্ত্রীও। সংস্কৃতে তাঁর ব্যুৎপত্তি যেমন, ফারসী ভাষাতেও তেমনই; এই দুই ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত সঙ্গীতশাস্ত্রগ্রন্থ তিনি পড়েননি এমন গ্রন্থ কমই আছে। ইতিহাসেও তাঁর অভিনিবেশ গভীর; তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর বুদ্ধি ও কল্পনা বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর। কিছুদিন আগে তিনি বাংলা টপ্পা গানের ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন; আমি তা পড়ে চমৎকৃত হয়েছিলাম। তারপর, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সঙ্গীতশাস্ত্র নিয়ে তাঁর আরও কয়েকটি রচনা আমার সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন আমি তাঁকে অনুরোধ করি, মধ্যযুগে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ বই লিখবার জন্য। তিনি বলেন 'সে সময় এখনও আসেনি; পূর্ণাঙ্গ বই লিখবার আগে ফারসী ভাষায় রচিত উপাদানগুলির যথাযথ অনুবাদ ও বিচার বিশ্লেষণ না হ'লে এ কাজটি সম্ভব নয়। আগে তা করে নিই। তা ছাড়া, নানা উপাদান উপকরণ নানাদিকে আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে; সেগুলোও একত্র সংগ্রহ করা দরকার।' এ-যুক্তি অগ্রাহ্য করবার উপায় ছিল না আমার। তা ছাড়া, আমি জানতুম, যে-সব ফারসী সঙ্গীতগ্রন্থ বা গ্রন্থধৃত অধ্যায় সম্পাদিত ও অনূদিত হ'য়েছে, সম্পাদকেরা ও অনুবাদকেরা সঙ্গীতনিপুণ না হওয়ার দরুন সর্বত্র যথাযথ সম্পাদন বা অনুবাদ সম্ভব হয়নি; সেগুলি সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন।

মধ্যযুগীয় ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস রচনা করতে হ'লে যে-কাজটি প্রথম করা দরকার, বর্তমান গ্রন্থে রাজ্যেশ্বরবাবু সে-কাজটি করেছেন, আমার ধারণা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে করেছেন, গভীর সততাসহ করেছেন। এ-পর্যন্ত আমরা যতদূর জানি, আইন-ই-আকবরী, রাগদর্পণ এবং তুহ্‌ফাতুল্ হিন্দ্, এই তিনটি গ্রন্থে মুঘল ভারতের সঙ্গীতচিন্তা বিধৃত হ'য়ে আছে। বর্তমান গ্রন্থে রাজ্যেশ্বরবাবু এই তিনটি গ্রন্থে বিধৃত তথ্যগুলির বর্ণনা দিয়েছেন মূলানুগ অনুবাদের মাধ্যমে। প্রসঙ্গত তিনি গ্রন্থরচনার ইতিহাস ও রচয়িতার জীবন, এবং সুলতানী ও মুঘল আমলের সাঙ্গীতিক পটভূমির পরিচয়ও রেখেছেন আমাদের সামনে। সুলতানী ও মুঘল আমলের দরবারগুলিতে যে সঙ্গীতের অনুশীলন হ'তো সে সঙ্গীত মূলত প্রাচীনতর ভারতীয় পরম্পরার

উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং মুসলমান সঙ্গীতশাস্ত্রীরা এদেশের সঙ্গীতচিন্তাকেই তাঁদের সঙ্গীতচিন্তার কাঠামোরূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। রাজ্যেশ্বরবাবুর এই বইটি অভিনিবেশে পাঠ করলে এ কথা স্বীকার করতে কোনো বাধা হয় না।

রাজ্যেশ্বরবাবু বলেছেন, "আইন-ই-আকবরী, রাগদর্পণ এবং তুহ্‌ফাতুল্ হিন্দ্, এই তিনটি গ্রন্থের বর্ণিত সঙ্গীত অনুসরণ করলে কেবলমাত্র মুঘল যুগেই নয়, সমগ্র মুসলিম যুগে মুসলমানগণ ভারতীয় সঙ্গীতকে কী ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন সে-সম্বন্ধে একটা সুসম্বদ্ধ ধারণা হয়। ছয়শত বৎসরব্যাপী মুসলমান শাসনে ভারতীয় সঙ্গীতে মুসলমানদের চিন্তাধারা কিরূপ ছিল তার পরিমাপ এ যাবৎ সামান্যই হয়েছে। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস নির্ধারণে এই বিষয়টির ব্যাপক আলোচনা হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।"

রাজ্যেশ্বরবাবু নিজেই এই গ্রন্থটি রচনা করে সে আলোচনার সূত্রপাত করে দিলেন, এজন্য আমরা তাঁকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২১ জুন ১৯৬৪

নীহাররঞ্জন রায়

মুঘল ভারতের সঙ্গীতচিন্তা

আইন-ই-আকবরী
রাগদর্পণ
তুহ্‌ফাতুল্ হিন্দ

মুখবন্ধ

সুলতান মাহ্‌মুদের ভারত আক্রমণ থেকেই ভারতে মুসলিম শাসনের সূচনা। ১০১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই শাসনের প্রারম্ভিক পর্ব। গজ্‌নীর ইয়ামিনী বংশীয় সুলতানরা আসলে ছিলেন তুর্কী এবং এই সময় থেকেই ভারতে তুর্কী রাজত্বের প্রতিষ্ঠাও সূচিত হয়। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মাহ্‌মুদের মৃত্যুর পর ভারতের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে মুলতান, লাহোর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইসলাম শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর পর এই অংশের দখল এল ঘোরী সুলতানদের হাতে। অতঃপর ১১৯২ সালে তরাওরীর যুদ্ধক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের ফলে উত্তর ভারতের দিল্লী পর্যন্ত মুসলিমদের দখলে চলে এল। কুতবুদ্দীন আইবক বসলেন দিল্লীর মসনদে। ১২১১ থেকে ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুলতান ইলতুতমিস রাজত্ব করেন। এর আগেই বাংলা, বিহার এবং দোআব অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে এসে গেছে। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান কায়কোবাদের মৃত্যু পর্যন্ত আড়াইশো বৎসরেরও অধিক কালকে মুসলিম শাসনের প্রথম পর্যায় বলা যায়।

এই কালের মধ্যে বহিরাগত শাসকসম্প্রদায় ভারতীয় সঙ্গীতকে গ্রহণ করেছেন, ভারতীয় নৃত্যগীতও দরবারে প্রচলিত হয়েছে; কিন্তু সঙ্গীতচিন্তায় তাঁদের আগ্রহ দেখা যায়নি। এ যুগের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতচিন্তার ফল শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকর (১২৩১)। নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেব দেবগিরিতে (দৌলতাবাদ) এই গ্রন্থ রচনা করেন। প্রচুর পরিশ্রমে তিনি তৎকালীন ভারতের প্রচলিত তাবৎ গীতের বর্ণনা দিয়েছেন। শার্ঙ্গদেব ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত সঙ্গীতকে সুবোধ্যভাবে ব্যাখ্যা করেন। এই সঙ্গীতরত্নাকর হচ্ছে নাট্যশাস্ত্রের পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক রচনা। মুসলিম সঙ্গীতবিদ্‌গণ সকলেই রত্নাকরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। শার্ঙ্গদেব যখন রত্নাকর রচনা করেন তখনও দেবগিরি মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

এই যুগের সঙ্গীতের সঙ্গে একজন সুবিখ্যাত শেখের নাম জড়িত। তিনি হচ্ছেন শেখ বাহাউদ্দীন জ্যাকেরিয়া। এঁর পূর্বপুরুষ আরবের অধিবাসী। ইনি মুলতানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৬৬ হিজরী সনে দিল্লীতে পরলোকগমন করেন। ইনিই নাকি মুলতানী এবং মুলতানী-ধনাশ্রী এই দুটি রাগের নাম

নির্দেশ করেন। তুর্কী ও মুঘল যুগের বহু শেখ সঙ্গীত ভালবাসতেন। গোয়ালিয়রের হাজী মুহম্মদ ঘাউস এর এক উজ্জ্বল উদাহরণ। অনেক বাধা সত্ত্বেও এঁরা এঁদের সঙ্গীতপ্রীতি বর্জন করেননি।

১২৯০ থেকে ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত খিলজী শাসন চলে। তার পরে এল তুঘলকদের শাসন। ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে তুঘলক শাসনের অবসান ঘটে এবং তার পর সৈয়দবংশীয়গণ ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এর পর ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে লোদীবংশীয়গণের রাজত্বের অবসানে ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

খিলজী এবং তুঘলক আমলের সঙ্গীতের সঙ্গে আমীর খুসরও এবং নায়ক গোপালের নাম বিশেষভাবে জড়িত। যদিও আমীর খুসরওয়ের ভারতীয় সঙ্গীতে দান নিয়ে বহু কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে তথাপি আসল সত্য এই যে, তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন না। তিনি নিজেকে ভারতীয় বলে স্বীকার করতেও দ্বিধা বোধ করতেন। ভারতীয় সঙ্গীতকে নিষ্প্রভ করবার উদ্দেশ্যেই তিনি পারসীক সঙ্গীতের মিশ্রণ আনতে চেয়েছিলেন। মূল ভারতীয় রাগকে ফার্সী সঙ্গীতের সঙ্গে মিশ্রিত করে ফার্সী নাম দেওয়ার একটি প্রথাও তিনি প্রবর্তন করেন। ফার্সী ভাষায় খুসরওয়ের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু ফার্সী সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর অনুরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। পারস্যের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। ভারতে আগত পারসীকদের কাছ থেকে অথবা ভারতে প্রচলিত পারসীক সঙ্গীত থেকেই তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন। এক্ষেত্রে যেসব মিশ্রণ তিনি করেছেন তার সার্থকতা এবং গুরুত্ব যে খুব বেশী ছিল এমন মনে হয় না। ফলে তাঁর সৃষ্টি খুব কম রাগই আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। কওল বা কাওআলী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার কারণ তার কাব্যগুণ। নায়ক গোপাল খুসরওয়ের কাছে প্রকৃতপক্ষে পরাজিত হননি। পরাজয়টি চাতুরী করে তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছে। মুসলমান লেখকগণ একবাক্যে গোপালের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। তবে খুসরওয়ের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে, লঘুভাবে হলেও তিনি একটি নতুন সৃষ্টির প্রচেষ্টা করেছিলেন। সনাতনপন্থী ভারতীয় সঙ্গীতকে তিনি মুক্তির একটা পথ দেখালেন। এই সময় থেকেই রাগসঙ্গীতে মিশ্রণের একটা প্রেরণা দেখা দেয়। বস্তুতঃ মুসলিম যুগের একটা প্রধান প্রচেষ্টাই হল ভারতীয় রাগসঙ্গীতে মিশ্রণদ্বারা সৌন্দর্যসম্পাদন।

আমীর খুসরওয়ের পরেই প্রযুক্ত সঙ্গীতবিদ্যায় যাঁর নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হচ্ছেন জৌনপুরের সুলতান হুসায়ন শাহ শর্কী (১৪৫৬-১৫০০)[১]। ইনি বিভিন্ন প্রকার তোড়ী এবং শ্যাম রাগের প্রতিষ্ঠাতা। এছাড়া খেয়াল, সাধরা প্রভৃতি তৎকালপ্রচলিত গীতে তাঁর বিলক্ষণ উৎসাহ ছিল। সারা জীবন যুদ্ধে ব্যাপৃত না থাকলে তিনি নিঃসন্দেহে সঙ্গীতের অধিকতর উৎকর্ষসাধন করতে পারতেন।

১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি সঙ্গীত সম্মেলনের[২] উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সম্মেলন "পণ্ডিতমণ্ডলী" নামে পরিচিত। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এলাহাবাদের নিকটবর্তী কাড়া নামক স্থানের এক সামন্ত মুসলমান রাজা। ইনি জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিমের অধীনস্থ ছিলেন। এঁর নাম সুলতানশাহী বলে উল্লেখিত আছে। এঁর আহ্বানে ভারতের বহু স্থান থেকে জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিগণ সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে কাড়ার সুলতান তৎকালীন সঙ্গীতের বিবিধ মতবিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনার অনুরোধ করেন। এতদনুসারে বহু আলোচনার পর সঙ্গীতশিরোমণি নামক একটি বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। এই গ্রন্থের পাঁচ বা ছটি অধ্যায়ে তৎকালীন গীতি, রাগ, তাল, প্রবন্ধ, প্রকীর্ণ (সঙ্গীতশৈলী), বাদ্য এবং নৃত্য সম্বন্ধীয় তাবৎ আলোচনা ছিল বলে মনে হয়। এই গ্রন্থের কিয়দংশ মাত্র পাওয়া গেছে।

সমগ্র সুলতানী শাসনে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনও মুসলমান পণ্ডিত ব্যক্তির প্রামাণিক গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়নি। মুঘল যুগেও যে এইরকম গ্রন্থ অধিক পরিমাণে রচিত হয়েছে এমন নয় কিন্তু কিছু চেষ্টা হয়েছে। এর মধ্যে আইন-ই-আকবরী এবং তুহফাতুল্ হিন্দ্—এই দুই গ্রন্থের সঙ্গীত অধ্যায়ে মুসলিম যুগের সঙ্গীতচিন্তার কিছু সংবাদ আমাদের গোচরে আসে। রাগদর্পণ নিঃসন্দেহেই একটি শ্রেষ্ঠ রচনা।

মুঘলযুগের প্রারম্ভে যিনি ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে সর্বাধিক চিন্তা করেছিলেন তিনিও একজন হিন্দু রাজা। গোয়ালিয়রের স্বনামধন্য নৃপতি রাজা মানসিং তোমর (শাসনকাল ১৪৮৬-১৫১৭)। ধ্রুপদ তাঁর সঙ্গীতচিন্তার প্রধান ফল। ধ্রুপদের প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছিল।

---

১ তাজকীরল উলেমা—মুহম্মদ খায়েরুদ্দীন

২ ভারতকোষ—রামকৃষ্ণ কবি

মানকুতুহল গ্রন্থেই এর উল্লেখ আছে এবং ফকীরুল্লাও তদীয় রাগদর্পণে এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ধ্রুপদের প্রতিষ্ঠায় নায়ক বখশু যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। বখশু পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সাবেক আমলের প্রধান নায়ক। আসলে ধ্রুপদ একটা নতুন সৃষ্টি নয়। বহু পূর্ব থেকে সালগ পর্যায়ের প্রবন্ধসঙ্গীত "ধ্রুব" ভারতে প্রচলিত ছিল। ক্রমে এর বহু রূপভেদ হতে থাকে। রাজা মান এই বিভিন্ন ধ্রুব গানকেই একটি সহজ এবং সুসম্বদ্ধ রূপ দিয়েছিলেন। রত্নাকরে (১২৩১) বর্ণিত ধ্রুব সঙ্গীতের পরিচয় থেকে এটি স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ধ্রুবগীতির বহু প্রকারভেদ ছিল।

মুঘল যুগে সঙ্গীতকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছিলেন আকবর। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পীদের মধ্যে একটা বিশেষ প্রেরণা জেগেছিল। কিন্তু অনুরূপভাবে আকবরের যুগে সঙ্গীতচিন্তার প্রসার ঘটেনি। তাঁর সময় গায়ক এবং বাদকগণ শিল্পকলায় দক্ষতার বিশেষ পরিচয় দেন। সঙ্গীতকে উক্ত যুগে একটি সুসংস্কৃত প্রমোদ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। রাগদর্পণে আকবরের যুগে রচিত একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু গ্রন্থটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে লেখক সন্দেহ পোষণ করেছেন। বাদাওনী[১] এ যুগে দুজন পণ্ডিত ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন যাঁরা সঙ্গীত সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এঁদের একজন হচ্ছেন মিয়া কাসিম কাহী। বহু শাস্ত্রে এঁর অধিকার ছিল। বাদাওনী জানিয়েছেন যে ইনি সঙ্গীতসম্বন্ধীয় গ্রন্থও রচনা করেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন চুঘ্‌তাই আমীর খন্‌জর বেগ। বাদাওনী বলেছেন ইনি পারসীক এবং হিন্দুসঙ্গীতের তথ্য আহরণ করেছিলেন এবং বিশেষ করে হিন্দুদের ষড়্‌রাগ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ অনুসন্ধিৎসা ছিল। এঁর লেখা কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

আকবরের যুগের পরে মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে তানসেনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে মতবিরোধ দেখা দেয়। যদিচ অধিকাংশ শিল্পী তানসেনকে ভারতীয় সঙ্গীতের একমাত্র আদর্শরূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তথাপি কোনও কোনও সম্প্রদায় তানসেনকে প্রধানরূপে স্বীকার করেননি। রাগদর্পণ-রচয়িতা ফকীরুল্লা তানসেনকে কেবলমাত্র উত্তম গায়ক হিসাবে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে রাজা মান, নায়ক বখশু প্রভৃতি গুণী ব্যক্তিদের মধ্যে

১ মুন্তখাবুৎতওআরিখ্‌

যে সঙ্গীতচিন্তা ছিল তানসেনের যুগে তাঁর প্রায় কিছুই ছিল না। এমনকি তানসেনকে "আতাই" বলতেও তিনি দ্বিধা করেননি। এ কথা সত্য যে তানসেনের সময় থেকেই পূর্ববর্তী রচয়িতাদের গীত ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। বখশু নাকি অন্যূন সহস্র ধ্রুপদ রচনা করেছিলেন। সেগুলিও খুব অল্পকালের মধ্যেই লোপ পেয়ে যায়। এই বিলোপ সাধনের জন্য তানসেন এবং তদীয় শিষ্যবর্গের যে হাত ছিল না এমন নয়। এঁরা যদি প্রাচীন গায়কদের গান কিছুটা চালু রাখতেন তা হলে সঙ্গীতের একটি মূল সম্পদ রক্ষিত হত। তানসেনকে একমাত্র ধ্রুপদ রচয়িতা বলে প্রমাণ করার জন্যই এই কাজ করা হয়েছে। এই অপচেষ্টা ফকীরুল্লার মত বিজ্ঞ ব্যক্তির অজানা ছিল না এবং এইজন্যই তিনি আকবরের যুগকে ভাল নজরে দেখেননি।

ফকীরুল্লার বর্ণনা থেকে জানা যায় শাহ্‌জাহানের আমল থেকেই খেয়ালের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। এই সময় থেকে নিবদ্ধগীত আরও একটু শিথিল হয়ে এসেছে। হিন্দু আমলে বিবিধ সঙ্গীতের সংগঠন এবং রীতিনীতির প্রতি কড়া নজর ছিল। এই অনুশাসনের ফলে গানের লালিত্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হত। মুসলমানগণ গানের মিষ্টতার দিকটাই বড় করে দেখতেন। সঙ্গীতের উপভোগের দিকটা ছিল তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড়। এই কারণে মুসলমান আমলে ধ্রুপদ নতুনভাবে সঙ্গীত হল বটে কিন্তু এই কলিনিবদ্ধ রূপ পূর্বকালের নিবদ্ধ সঙ্গীত অপেক্ষা অনেক মুক্তভাবাপন্ন। আসলে খেয়াল আকবরের যুগেও গাওয়া হত কিন্তু দরবারে তার স্থান ছিল না। শাহ্‌জাহানের সময় খেয়ালের প্রসার ঘটলেও দরবারে খেয়াল রীতিমত গাওয়া হত এমন প্রমাণ নেই। অথচ খেয়াল একটি গীতরূপ হিসাবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে।

ফকীরুল্লার রাগদর্পণ রচনার কিছুকাল পরেই তুহ্‌ফাতুল্‌ হিন্দ রচিত হয়। লেখক মীর্জা খাঁ, ফকীরুল্লা যে-সব বিষয়ে বিশেষ ভাবে বলেছেন সে সম্বন্ধে আর অধিক বলেননি। তবে ফকীরুল্লা যেগুলি বাদ দিয়েছেন সেগুলি তিনি পাঠকদের গোচর করেছেন। মীর্জা খাঁর বিশেষত্ব এই যে, তিনি রাগমালা-চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত রাগবিবোধ, সঙ্গীতদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে রাগরাগিণীর ধ্যানমূর্তির উল্লেখ পাওয়া গেলেও রাগমালা-চিত্রের কোনও উল্লেখ নেই। মীর্জা খাঁ নিজে অথবা তদীয় গ্রন্থের সঙ্গীতাধ্যায় সঙ্কলনে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে রাগমালা চিত্রাদি দর্শন করেছিলেন। এ যুগে রাগমালা-চিত্র সম্পর্কে মীর্জা খাঁর মতই প্রামাণিক

বলে স্বীকৃত হবে। মীর্জা খাঁ অনেকগুলি তালেরও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এইগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুকরণ মাত্র এবং এই উল্লেখের কোনও তাৎপর্য দেখা যায় না; কারণ এই সব তাল বহু পূর্ব থেকেই উত্তর ভারতে অপ্রচলিত হয়ে গেছে। মীর্জা খাঁর সময়ে (১৬৭৫) হিন্দু যুগের লঘু গুরু বর্ণ অনুযায়ী মাত্রাবিন্যাস অনুসৃত হত না। বর্তমান মাত্রা নির্ধারণপ্রণালী তখন থেকেই শুরু হয়েছে। অথচ, কি ভাবে প্রাচীন দেশী তাল থেকে বর্তমান পদ্ধতি নির্ণীত হল সে সম্বন্ধে মীর্জা খাঁ কিছুই বলেননি। বস্তুত, এমন একটি গ্রন্থও আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি যাতে বর্তমান তালপদ্ধতির সূত্র পাওয়া সম্ভব। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বাস্তবনিষ্ঠ ছিলেন এবং একমাত্র তাঁরাই এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে পারতেন; কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরাও কিছুই খুলে বলেননি।

মীর্জা খাঁ এবং ফকীরুল্লা—উভয়ের বর্ণনা থেকেই জানা যায় যে টপ্পা এবং ঠুংরী বেশ পুরাতন গীত। ঠুংরীর সঙ্গে বারোয়ার প্রত্যক্ষ যোগ ছিল এবং এখনও আছে। টপ্পা নামটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পূর্বে এই গীতকে "ডপা" বলা হত। উভয় গ্রন্থকারই ডপা শব্দের উল্লেখ করেছেন। অতএব যাঁরা টপ্পা শব্দ থেকে এই গীতের উৎপত্তি খোঁজেন বা ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেন তাঁদের অনুমান ঠিক কি না সে বিষয়ে সন্দেহ বর্তমান।

মীর্জা খাঁ পারসীক সঙ্গীতের বিবরণ দিয়েছেন কিন্তু এই বিবরণ থেকে আমাদের বিশেষ লাভ হয়নি কারণ পারসীক সঙ্গীত এবং ভারতীয় সঙ্গীতের যোগসাধন কতখানি হয়েছিল সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি; কেবলমাত্র কয়েকটি পারসীক সুরের সঙ্গে দেশীরাগের ঐক্য সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা হয়েছে।

তুহ্‌ফাতুল হিন্দ্‌ গ্রন্থের সঙ্গীত অধ্যায় এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোন্স পাঠ করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁর On the Musical Modes of the Hindus (১৭৯৯) প্রবন্ধে মীর্জা খাঁ বর্ণিত রাগরাগিণী সম্বন্ধীয় মতবাদের আলোচনা আছে। বাংলায় রাধামোহন সেন তাঁর সঙ্গীততরঙ্গ (১২২৫ বঙ্গাব্দ) নামক গ্রন্থে তুহ্‌ফাতুল হিন্দের সংক্ষিপ্তসার প্রদান করেছেন এবং রাগরাগিণীর আকৃতিবর্ণনায় নিজস্ব কল্পনাও বহুল পরিমাণে যোগ করেছেন। উইলার্ড তাঁর A Treatise on the Music of India নামক গ্রন্থেও (১৮৩৪) তুহ্‌ফাতুল্‌ হিন্দ্‌ থেকে মিশ্ররাগের তালিকাটি প্রস্তুত করেছিলেন বলে মনে হয়। আধুনিক কালে মুহম্মদ জীয়াউদ্দীন বিশ্বভারতী

কর্তৃক প্রকাশিত তদীয় Mirza Khan's Grammar of the Braj Bhakha (১৯৩৫) নামক গ্রন্থে মীর্জা খাঁ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

বস্তুতঃ আইন-ই-আকবরী, রাগদর্পণ এবং তুহ্‌ফাতুল্‌ হিন্দ্‌—এই তিনটি গ্রন্থের বর্ণিত সঙ্গীত অনুসরণ করলে কেবলমাত্র মুঘল যুগেই নয় সমগ্র মুসলিম যুগে মুসলমানগণ ভারতীয় সঙ্গীতকে কী ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন সে সম্বন্ধে আমাদের একটি সুসম্বদ্ধ ধারণা হয়। ছয়শত বৎসর ব্যাপী মুসলমান শাসনে ভারতীয় সঙ্গীতে মুসলমানদের চিন্তাধারা কিরূপ ছিল তার পরিমাপ এ যাবৎ সামান্যই হয়েছে। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস নির্ধারণে এই বিষয়টির ব্যাপক আলোচনা হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত সঙ্গীত

আইন-ই-আকবরীর সঙ্গীতাধ্যায় পরিসরে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সঙ্কলনটি মূল্যবান। বস্তুত সামান্য কয়েকটি পৃষ্ঠায় উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। আবুল ফজলের অসামান্য সম্পাদন কৌশলে তথ্যগুলি উপযুক্ত বিন্যাসে রক্ষিত হয়েছে।

আবুল ফজল এই অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন "সঙ্গীত"। সঙ্গীত শব্দের সংজ্ঞা নিরূপণে তিনি বলেছেন—সঙ্গীত হচ্ছে বিভিন্ন নাঘ্‌মা (গীত), সাজ (বাদ্য) ও রকুস্ (নৃত্য) এবং এতদ্ব্যতীত এই-জাতীয় অপরাপর বিষয় সম্পর্কীয় বিদ্যা। আমাদের তৌর্যত্রিক শব্দকে ফার্সী ভাষায় এই ভাবে বোঝান হয়েছে। অতঃপর তিনি বলছেন যে এতদুদ্দেশ্যে সাতটি অধ্যায় পরিকল্পিত হয়েছে। প্রথমে স্বর অধ্যায় অর্থাৎ আওয়াজ সম্পর্কীয় তত্ত্ব। স্বর অর্থে আওয়াজ শব্দটি আজ পর্যন্ত গায়ক সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। আওয়াজ দুই প্রকার—

অনাহত—এমন একটি আওয়াজ যা কারণদ্বারা ঘটে না। এটি এক এবং শাশ্বত (কদীম্) বলে পরিজ্ঞাত। কোনও ব্যক্তি যখন আঙ্গুল দিয়ে দুটি কান বন্ধ করে তখন ভিতরে একটি ধ্বনি শুনতে পায়। এই কারণেই এর অনাহত নাম দেওয়া হয়েছে। এটি ব্রহ্মাসম্ভূত বলে ধারণা। এর পরিচয় যখন অভ্যাসের দ্বারা পাওয়া যায় এবং বিনা মধ্যস্থতায় এটি শ্রুত হয় তখনমুক্তি হয়ে থাকে।

আহত—কোনও কারণ সহযোগে একটি আওয়াজের উৎপত্তি হলে তাকে আহত বলে। বাক্যের মত এটিও বায়ুপ্রেরিত সংঘটন বলে অনুমান করা হয় এবং আঘাতজনিত কার্য থেকে এর অভ্যুদয়। এইরকম ধারণা আছে যে, নিম্নজঠর, গলা এবং মস্তিষ্কের শীর্ষ—এই অঙ্গগুলিতে ভগবৎপ্রভাবে বাইশটি নাড়ি (রগ্) বিস্তৃত রয়েছে। নাভিদেশ থেকে মনোহর গতিতে বায়ুপ্রবাহ উত্থিত হয় এবং এর বিস্তারগত প্রকৃতির আধিক্য বা মন্থরতা অনুসারে এই আওয়াজ জাগ্রত হয়। কথিত আছে যে, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ—এই চারটি নাড়িতে বায়ুপ্রবাহ পৌঁছয় না। বাকি আঠারোটিতে যে আওয়াজ জাগ্রত হয় তাকে সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিভাগটি এইরূপ—

ষড়্‌জ—ময়ূরের আওয়াজ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চতুর্থ নাড়ি থেকে এর অভ্যুদয়।

ঋষভ (রিঘ্‌বে)—পাপিয়ার আওয়াজে সূচিত হয়। সপ্তম থেকে দশম নাড়ি পর্যন্ত এর বিস্তৃতি।

গান্ধার—পুং-ছাগের আওয়াজ থেকে গৃহীত। নবম থেকে ত্রয়োদশতম পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি।

মধ্যম—সারসের শব্দ থেকে এটি পরিচিত হয়েছে। ত্রয়োদশতম নাড়ি পর্যন্ত এর গতি।

পঞ্চম—কোয়েলের সুরেলা কণ্ঠ থেকে গৃহীত। এটি সপ্তদশ নাড়ি পর্যন্ত অধিকার করে আছে।

এই কথাটি "জম্‌জমা-ই-কোয়েল" এই ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। জম্‌জমা শব্দটি আমাদের সঙ্গীতে টপ্পার দানাদার তান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আসলে জম্‌জমা (zamzama) শব্দের অর্থ সুর করে পড়া, ইংরেজীতে যাকে chant বলে সেই রকম। জম্‌জমা-পরদাজ্, জম্‌জমা-সন্‌জ্, জম্‌জমা-গুইয়ান্, জম্‌জমা-নাক্—এই সব শব্দে গায়ক বোঝায়।

ধৈবত—ভেকের আওয়াজ থেকে গৃহীত। অষ্টম থেকে দ্বাবিংশতিতম নাড়ি পর্যন্ত এর গতি।

এই অষ্টমটি হয় মুদ্রণপ্রমাদ অথবা লিপিকারের ভ্রম। এটি বিংশ থেকে দ্বাবিংশ হলে সঙ্গত হত।

নিষাদ (নিখাদ)—হস্তীর আওয়াজ থেকে পরিকল্পিত। দ্বাবিংশ থেকে পরবর্তী মণ্ডলীর তৃতীয় পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রত্যেকটি সপ্তক পর পর তিনটি পর্যায় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। অবশ্য এই তিন সপ্তকের অবস্থিতির মধ্যে নিখাদ বাইশটির বেশী ব্যাপ্তি অধিকার করবে না।

এই বর্ণনায় শ্রুতির উল্লেখ নেই। অবশ্য বাইশটি নাড়ির শাস্ত্রীয় সমর্থন রয়েছে।

হৃদ্যূর্দ্ধনাড়িসংলগ্নানাড্যোদ্বাবিংশতির্মতাঃ।
তিরশ্চ্যস্তাসু তারত্যাঃ শ্রুতয়ো মারুতাহতে॥
উচ্চোচ্চতরতাযুক্তা প্রভাবন্ত্যুত্তরোত্তরম্।
এবং কণ্ঠে তথা শীর্ষে শ্রুতির্দ্বাবিংশতির্মতাঃ॥

—সঙ্গীতরত্নাকর, স্বরাধ্যায়

আবুল ফজল সপ্তক এবং রাগ দুই অর্থেই "নাঘ্‌মা" শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। বস্তুতঃ এই শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নাঘ্‌মা বলতে মিষ্ট স্বর, সুরসহযোগে পাঠ, সুরলহরী, গীত, গমক প্রভৃতি অনেক কিছু

সাঙ্গীতিক প্রক্রিয়া বোঝায়। একপ্রকার গীতকেও নাঘ্‌মা বলা হয়। অতঃপর বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক সপ্তকে সাতটির প্রত্যেকটি স্বর থাকলে তাকে সম্পূর্ণ বলা হয়। যদি ছটি থাকে তা হলে প্রধান স্বরটি অবশ্য প্রকাশিত থাকবে। একে খাড়ো (খাড়ব বা ষাড়ব) বলে। বিশেষজ্ঞেরা পাঁচটি স্বর থাকলে তাকে বলেন ঔড়ব (ঔড়ুব)। এতেও প্রধান স্বরটি অবশ্য প্রকাশিত থাকবে। কোনও রাগে এর চেয়ে কম ব্যবস্থা থাকবে না। কিন্তু তানের বেলায় এটি একটি বিশেষ প্রক্রিয়া হওয়াতে ছটি স্বরের সংযোগও সম্পূর্ণ বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় রাগবিবেক অধ্যায়

রাগরাগিণী সম্বন্ধে আবুল ফজল বলেছেন—দর রঙ্গারঙ্গ মোকাম ও সুবা ; অর্থাৎ এরা নানাপ্রকার মোকাম ও সুবার অন্তর্গত। সাধারণ অর্থে মোকাম বলতে অবস্থান ও সুবা বলতে বিভাগ বোঝায়। এর অপর সাঙ্গীতিক অর্থ আছে। পারসীক সঙ্গীতে বারোটি মোকাম ও প্রত্যেকটি মোকামে ছটি সুবার অস্তিত্ব আছে। এই মোকাম আমাদের রাগ ও সুবা আমাদের রাগিণীর অনুরূপ। মহাদেব এবং পার্বতী থেকে এদের উৎপত্তি। মহাদেবের পঞ্চমুখ। প্রত্যেকটি থেকে একটি সুর (নাঘ্‌মা) আবির্ভূত হয়েছে। এই ধারাটি এইরকম—শ্রীরাগ, বসন্ত, ভৈরোঁ, পঞ্চম, মেঘ ও পার্বতী কর্তৃক গীত নটনারায়ণ। এই ছটির প্রত্যেকটিকে হিন্দীভাষায় রাগ বলা হয়। এই ছটি রাগই ঈশ্বরমত বলে পরিচিত। এই রাগগুলিকে মূল বলে গণনা করা হয়। এর যে কোনটির অনেকগুলি শাখা বর্তমান। শ্রীরাগকে সম্পূর্ণ বলে স্বীকার করা হয়। এতে ব্যবহৃত রেখাব অষ্টম নাড়িতে এবং পরবর্তী গান্ধার দশম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মধ্যম ত্রয়োদশ থেকে উৎপন্ন হবে। ধৈবত একবিংশ শ্রুতি পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। নিখাদ কেবল একটিতে ব্যাপ্ত থাকবে। এইরূপে সমুদয় প্রকারভেদেই নানারূপ পরিবর্তন হয়ে থাকে।

প্রথম অর্থাৎ শ্রীরাগের প্রকারভেদ—

মালবী, এবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী ও বিহারী।

ঈশ্বর বা শিবমত অনুসারে মালবীর স্থানে মালশ্রী হবার কথা এবং বিহারী পাহাড়ী হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় বসন্তের প্রকারভেদ—

দেশী, দেওগিরী, বরাটী, টোড়ী, ললিতা এবং হিন্দোলী।

তৃতীয় ভৈরোঁর প্রকারভেদ—

মধ্যমাদি, ভৈরবী, বাঙ্গালী, বরাটিকা, সৈন্ধবী ও পুনর্জ্জেয়া (পুনর্গেয়া)।

ঈশ্বরমতের পরিবর্তে এখানে হনুমনমত বর্ণনা করা হয়েছে। এই মত অনুসারে প্রতি রাগের সঙ্গে পাঁচটি রাগিণী যুক্ত হয়। এক্ষেত্রে পুনর্জ্জেয়া (বা পাঠভেদে পুনর্গেয়া) একটি ভিন্ন রাগ হতে পারে না। এটি ভ্রমক্রমে যোজিত হয়েছে। ঈশ্বরমতে এই প্রকারভেদটি এইরকম হবে—ভৈরবী, গুর্জরী, রামকিরী, গুণকিরী, বঙ্গালী এবং সৈন্ধবী।

চতুর্থ রাগপঞ্চমের প্রকারভেদ—

বিভাস, ভূপালী, কানরা, বড়হংসিকা, মালশ্রী এবং পটমঞ্জরী। ঈশ্বর-মত অনুযায়ী মালশ্রীর স্থানে মালবী হওয়া উচিত ছিল।

পঞ্চম মেঘরাগের প্রকারভেদ—

মল্লার, সৌরঠী, আসাওরী, কৈশিকী, গান্ধারী ও হরশৃঙ্গারী।

ষষ্ঠ নটনারায়ণের প্রকারভেদ—

কামোদী, কল্যাণ, আহিরী, শুধ্‌-নাট, সালক, নট-হামীর।

যেহেতু এগুলি রাগিণী সেহেতু সঙ্গীতদর্পণে কল্যাণী, নাটিকা (শুধ্‌-নাট) সারঙ্গী এবং নট-হম্বীরা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, সারঙ্গকে সালক বলা হয়েছে। অনেক গ্রন্থে সালক বা সালেক রাগের উল্লেখ আছে। এটি সারঙ্গ ভিন্ন অপর রাগ নয়—এইটাই অনুমান করতে হয়। সঙ্গীতরত্নাকর জানিয়েছেন যে, প্রাচীন দ্রাবিড় গৌড় নামক রাগটি ত্রয়োদশ শতকে সালক নামে পরিচিত ছিল।

অতঃপর আবুল ফজল বলছেন—কোনও কোনও সম্প্রদায় প্রত্যেকটি রাগের পাঁচটি করে রাগিণী নির্দেশ করেন এবং অন্য নানারকম প্রকারভেদও হয়ে থাকে। অনেকে বসন্ত, পঞ্চম ও মেঘ এই তিনটির স্থানে মালকোস্‌ক্‌ (মালকোশ), হিন্দোল ও দীপক—এই তিনটি স্থাপন করেন এবং এই ছটি রাগের প্রত্যেকটির জন্য পাঁচটি প্রকারভেদের উল্লেখ করেন। কেহ কেহ এর মধ্যেও পরিবর্তন সাধন করে থাকেন। কোনও সম্প্রদায় দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম রাগের স্থানে শুধ্‌-ভৈরোঁ, হিন্দোল, দেশকার ও শুধ্‌-নাটের উল্লেখ করে থাকেন।

সঙ্গীত প্রসঙ্গে আবুল ফজল বলেছেন যে, গায়নশিল্পীরা (নাঘমা-সুরাই)

যে গান করেন তাকে দুই পর্যায়ে গণনা করা হয়। একটির নাম মার্গ। এই শ্রেণীর গীত দেবতা ও ঋষিদের সৃষ্টি বলে গণ্য। দেশভেদে এই গীতের পরিবর্তন হয় না। এটি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বলে পরিগণিত। এই সঙ্গীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অধিকসংখ্যক দক্ষিণাংশে বর্তমান (সনাসন্দেগান্-ই-আন দিয়ারে-ই দকন্ ফরওয়ান্)। এই সঙ্গীতে ছয় প্রকার এবং এর আরও বেশী প্রকারভেদ হতে পারে। মার্গসঙ্গীতের কয়েকটি আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন। যথা—

সূর্যপ্রকাশ, পঞ্চতালেশ্বর, সর্বতোভদ্র, চন্দ্রপ্রকাশ, রাগকদম্ব, ঝোমরা ও স্বরবর্তনী।

আইন-ই-আকবরীতে উপরিউক্ত গীতগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়নি। সূর্য-প্রকাশ বারোটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। এটি সূর্যের স্তুতিসূচক গীত। রাগ, তাল প্রভৃতি সহকারে এটি গাওয়া হত। চন্দ্রপ্রকাশ এরই অনুরূপ। এটি চন্দ্রের স্তুতিসূচক গীত। এটি ষোল খণ্ডে বিভক্ত ছিল। পঞ্চতালেশ্বর রাগালাপ সহযোগে বিভিন্ন প্রাচীন তাল অবলম্বনে গাওয়া হত। এই তানগুলির মধ্যে ছিল চচ্চৎপুট, চাচপুট, ষট্পিতাপুত্রক, সম্পক্কেষ্টক এবং উদ্ঘট। এই তালগুলি খুবই প্রাচীন তাল। মুঘল আমলে এইসব মার্গতালের প্রয়োগ হত না। তালগুলি সম্ভবত পাল্টে গিয়েছিল। এই গীতে পাঁচটি পদ বিভিন্নভাবে গাওয়া হত। সর্বতোভদ্রনামক গীতটিতে আটটি অক্ষরে একটি পদ রচিত হত। এর প্রথম চারটি অক্ষর উল্টোপাল্টাভাবে আবর্তিত হত। এর একটি উদাহরণ সোমেশ্বর তাঁর মানসোল্লাস গ্রন্থের গীতবিনোদ অধ্যায়ে প্রদান করেছেন। ঝোমরা নামক গীতের চারটি কলি ছিল এবং দেবতাদের প্রশংসায় এই গীত রচিত হত। স্বরবর্তনীও প্রশংসাসূচক গীত। রাগকদম্ব নামক গীতে বিভিন্ন ছন্দ ও তাল প্রযুক্ত হত। প্রসিদ্ধ গায়ক গোপালনায়ক স্বরবর্তনী এবং রাগকদম্ব গাইতেন। সঙ্গীতরত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ লিখেছেন যে, গোপাল বত্রিশটি রাগতালযুক্ত ভ্রমর নামক এক শ্রেণীর রাগকদম্বক গীতের অনুষ্ঠান করতেন। আমীর খুস্রওয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বে গোপাল স্বরবর্তনী নামক গীতেরও অনুষ্ঠান করছিলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর গীতকে দেশী বলা হয়। এটি একটি বিশিষ্ট স্থানের প্রচলিত গীতি। যেমন, ধ্রুপদ। এই গীত রাজধানী আগ্রা, গোয়ালিয়র, বারী ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে প্রচলিত। পূর্বকালে এই অঞ্চলে বড় বড় গান গাওয়া হত। যখন গোয়ালিয়রের রাজা মানসিং শাসনে নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি উত্তম কলাকার যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে নায়ক বখশু, মাহমুদ (মাচু পাঠ অশুদ্ধ) ও ভানুর সহযোগিতায় এক বিশেষ সর্বস্বীকৃত রীতি (তরজ) নির্বাচনপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বখশু ও মাহমুদ গুজরাটের সুলতান মাহমুদের অধীনে অবস্থান করেন। এই সময় তাঁদের পসার ফিরে গেল এবং এই রীতিটি (রওইশ) সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হল।

ধ্রুপদের আকৃতি সম্পর্কে আবুল ফজল বলছেন যে, ধ্রুপদ চারটি ছন্দোপবদ্ধ পংক্তির সমষ্টি এবং এর শব্দ ও বর্ণাদি যে সব সময়েই সমান হবে এমন নয়। এতে প্রেমের বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় এবং এর সৌন্দর্য চিত্তহারী।

অতঃপর অপরাপর সঙ্গীত সম্পর্কে বলা হয়েছে। দক্ষিণ দেশে দ্রাবিড়ী ভাষায় প্রচলিত গীত "চন্দ্" নামে প্রচলিত। এই গীত তিনটি বা চারটি পংক্তির সমষ্টিতে রচিত হয়। এতে প্রশংসাসূচক ভাবই অধিক পরিমাণে থাকে। তিলঙ্গ এবং কর্ণাটকের ভাষায় রচিত গীতকে ধরু বলা হয়। এই গীতে প্রেমিকদের কোমল মিনতির বাণী উচ্চারিত হয়। যে গীত বাংলায় প্রচলিত তাকে বঙ্গলা বলে। যে গীত জৌনপুরে প্রচলিত তাকে চুটকলা বলে। দিল্লীতে যে গীত গাওয়া হয় তার নাম কওল ও তরানা। আমীর খুস্রও দহলবী সমুত ও তাতার নামক দুজন গায়কের মুখে শোনা তাঁদের ভাষার গীত ভেঙে এই ধরন দুটির প্রবর্তন করেন এবং এই উদ্দেশ্যে ফার্সী, সাউৎ, নক্শ্—এই সকল গীতপদ্ধতি এবং হিন্দী গীতপদ্ধতি অবলম্বন করেন। এতে এই গীত দুটি অধিকতর মনোহারিত্ব অর্জন করে।

আমীর খুস্রও সাউৎ ও নক্শ্ নামক পারসীক পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পরে অমল্, নক্শ্, সাউৎ প্রভৃতি গীত পারস্য এবং তুর্কী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কওল্, ঘজল্, তরানা এগুলিও পারসীক নওবার অন্তর্গত ছিল (History of Music, Oxford)। আমীর খুস্রও চাতুর্যের সঙ্গে এগুলি ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

এর পর আবুল ফজল বলছেন যে, মথুরায় প্রচলিত যে-সব গান আছে তাদের বলে বিষণপদ। এতে ছয় বা সাতটি লাইন থাকে। এর বিষয়বস্তু কৃষ্ণের স্তুতি। সিন্ধুদেশে প্রচলিত গানের নাম কানী বা কালী। রাগদর্পণ গ্রন্থে একে কাবী (কাব্য) বলা হয়েছে। এতে প্রেমভাবের বাহুল্য দেখা যায়। তিরহুতের ভাষায় প্রচলিত গানকে লহচারী বলে। এই গানগুলি বিদ্যাপতির রচনা এবং উদ্বেলিত প্রেমসঙ্গীত। লাহোর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের গানকে ছন্দ্ বলে। এটিও প্রেম ও তজ্জনিত হতাশাব্যঞ্জক সঙ্গীত। এতেও গানের মধ্যে কাব্য আবৃত্তি করা হয়। গুজরাটে যে গান গাওয়া

হয় তাকে জক্রী বলে। যুদ্ধস্থলে এবং বীরগণের প্রশংসায় গীত গানকে কর্কা বলে। এগুলিকে সাদ্রাও বলা হয়। এই গানগুলি চার বা ছটি (পাঠান্তর ছয় বা আট) ছত্রে গঠিত এবং বিভিন্ন ভাষায় গাওয়া হয়ে থাকে।

এই গীতগুলি ভিন্ন অন্যান্য বহু ধরনের গীত শোনা যায়, যেমন—সারঙ্গ, পূর্বী, ধনাশ্রী, রামকলী, কুড়ায়ী (মহামান্য সম্রাট একে সুঘ্রায়ী বলে থাকেন)। অপরাপর শ্রেণীর মধ্যে সুহ্, দেশকাল ও দেশাক এই তিনটির নাম করা হয়েছে। এগুলি সবই রাগ হিসাবে খ্যাত। কিন্তু আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে মনে হয় একদা এইগুলি এক-একপ্রকার গীতগোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল।

এর পর তৃতীয় প্রকীর্ণ অধ্যায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রকীর্ণ নামটি সঙ্গীতরত্নাকর থেকে সংগৃহীত। আবুল ফজল বলছেন যে, এতে "আলাপ"-এর রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। এটি বর্ণনা সম্পর্কীয় ব্যাপার (নাসেরখানী অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ নয়)। এটি দুই প্রকার—একটি রাগালাপ; এটিতে রাগের অনুষ্ঠান হয়। প্রচলিত ভাষায় একে বলা হয় আদা এবং তাসের্রুফ্। অপরটি রূপ-আলাপ। এটি কাব্যময় রূপের (মনজুম্, manzum) অনুষ্ঠান এবং কতকগুলি আবেগপূর্ণ উচ্চারণে এই অংশটি অনুষ্ঠিত হয়। আদা শব্দে সৌন্দর্য এবং তাসের্রুফ অর্থে অধিকার অর্থাৎ রাগের মূল ভাবটিকে অধিকার করা বোঝায়।

তার পর চতুর্থ প্রবন্ধ অধ্যায়। এর বিষয়বস্তু গীতবন্ধনের প্রণালী। কাব্যে রচিত এবং রাগে অনুষ্ঠিত একটি প্রবন্ধ ছটি অঙ্গে নিবদ্ধ; যথা—স্বর, বিরুদ (প্রশংসা), পদ (নাম অর্থাৎ বিষয়বস্তুর অনুষ্ঠান)। আবুল ফজল একে বলছেন নাম-ই-মামদুহ্। এর অর্থ নামের স্তুতি। পদ বলতে গেয় বস্তু বোঝায়। নামের স্তুতি বিরুদ শব্দে প্রযোজ্য হওয়া উচিত ছিল। তনা (সংস্কৃত তেনক)—একে তন্তনা এই রকম উচ্চারণ করা হয় এবং এই উচ্চারণে সুন্দর পঙ্‌ক্তি রচনা করা হয় (ফেকুরাৎ আদা করদন্)। পাট—পূর্বোক্ত তন্ত্না জাতীয় উচ্চারণ। তিন থেকে বিশ হরফে এই উচ্চারণ করা হয়। এই উচ্চারণও বিশেষ ঢঙে বার বার কবিতার চরণের মত অধিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আসলে পাট-শব্দে বাদ্যাক্ষর অর্থাৎ মৃদঙ্গজাতীয় বাদ্যের বোল বোঝায়। আবুল ফজলের পণ্ডিতগণ এইটিও ভালভাবে বুঝিয়ে বলেননি। তাল—একে জর্ব্ (zarb) বলা হয়। জর্ব্-ই-উসুল শব্দে তাল দেওয়া বোঝায়। এটি ছটি অঙ্গে নিবদ্ধ হলে সেই গীতকে

মেদিনী বলে। এই অঙ্গাদির একটির অবর্তমানে তাকে বলে আনন্দিনী (আন্দ্নী); দুটি না থাকলে দীপনী; তিনটি না থাকলে ভাবনী; চারটি না থাকলে তারাবলী বলে। দুটি অঙ্গে নিবদ্ধ হলে গীত উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায় না।

উক্ত চারটি অধ্যায়ে সুরের নানারকম বৈচিত্র্য (নাউরঙ্গী) বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম—তাল অধ্যায়। এতে ছন্দোরক্ষার্থে আঘাতের প্রকৃতি এবং পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে। আবুল ফজল তাল সম্বন্ধে কোনও বর্ণনা দেননি।

এর পরে ষষ্ঠ—বাদ্য অধ্যায়। এর বিষয়বস্তু প্রকারভেদ ও তৎসম্পর্কীয় আলোচনা। এটি চার প্রকার—তত—যেগুলি তারে বাজান হয়; বিতত—যেগুলি চর্মে আঘাত করে বাজান হয়; ঘন—দুটি কঠিন বস্তু যাদের সংঘাতে আওয়াজ উৎপন্ন হয়; সুষির (সুখির)—যেগুলি ফুৎকারযোগে বাজান হয়। এই প্রত্যেকটির অনেকগুলি প্রকারভেদ আছে। আবুল ফজল এর কয়েকটির উল্লেখ করেছেন।

প্রথম পর্যায়ের বাদ্য

যন্তর—কাষ্ঠনির্মিত। লম্বায় এক গজ। ভিতরটা ফাঁপা। দুদিকে দুটি লাউ যুক্ত থাকে এবং উপর দিয়ে পাঁচটি লোহার তার দুদিক থেকে দৃঢ়ভাবে বাঁধা থাকে।

যন্ত্র শব্দে এক সময় ত্রিতন্ত্রী বীণা বোঝাত। সঙ্গীতরত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ বলেছেন—ত্রিতন্ত্রীকৈব লোকে যন্ত্রশব্দেনোচ্যতে।

বীণ—যন্তরের মত কিন্তু এতে তিনটি তার বর্তমান।

আবুল ফজল এর বর্ণনায় বলেছেন—সেহ্তার দারদ্। সম্ভবত বীণ-সেহ্তার থেকে বর্তমান সেতার শব্দের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

কিন্নর—বীণের মত কিন্তু দণ্ডটি ঈষৎ বেশী লম্বা এবং তিনটি লাউ ও দুটি তার থাকে।

সুরবীণ—বীণের মত কিন্তু এতে পর্দা থাকে না।

অমৃতী (অম্বরতী)—এর দণ্ডটি সুরবীণের দণ্ড অপেক্ষা ছোট। একটি ছোট লাউ উপরের দিকে একটু নিম্নভাগে সংলগ্ন থাকে। একটি লোহার তারে অপরিবর্তিত ভাবে সব কটি পর্দা বাজান যায়।

রবাব—এতে ছটি তাঁতের তার থাকে। কোন কোন যন্ত্রে বারোটি এবং কোনটিতে আঠারোটি তারও থাকে।

স্বরমণ্ডল—কানুন-এর মত যন্ত্র। এতে একুশটি তার থাকে। অনেক

লোহার তার ব্যবহার করেন, কেহ কেহ তামার তার ; কোনও সম্প্রদায় তাঁতের তার ব্যবহার করেন।

এটি পাশ্চাত্য Dulcimer of Psalteryর অনুরূপ। আমাদের দেশেও প্রাচীন কাল থেকে এই বাজনাটি চলে এসেছে। সংস্কৃত শাস্ত্রে এর অপর নাম মত্তকোকিলা।

সারেঙ্গী—আকৃতিতে রবাবের চেয়ে ছোট। ঘীচকের মত বাজান হয়।

ঘীচক বাদ্যটিও আকবরের সময় ভারতে দেখা যেত। এই বাদ্যটি পারস্য দেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল। এটি Viol জাতীয় বাদ্য, ছড়ি দিয়ে বাজানো হত।

পিনাক—একে স্বরবিতানও বলা হয়। কাষ্ঠনির্মিত। আয়তনে ধনুকের মত ঈষৎ বক্র। ধনুকের ছিলার মত স্নায়ুনির্মিত একটি পাকানো তার এর উপরে বাঁধা থাকে। কাষ্ঠনির্মিত পেয়ালার মত একটি পাত্র এই বাদ্যের দুদিকে নিম্নমস্তকে অর্থাৎ উল্টোভাবে বসানো থাকে। এই যন্ত্রটিও ঘীচকের মত বাজান হয় কিন্তু বাঁ হাতে একটি ছোট লাউ রাখা হয় এবং এটি বাজাবার কাজে লাগে।

সঙ্গীতরত্নাকরেও পিনাকী বীণার অনুরূপ বর্ণনা দেওয়া আছে। বাম হস্তে তুষের পরিবর্তে আর্দ্রচর্মকৃত শুষ্ক পেশীও তন্ত্রীপীড়নের জন্য ব্যবহৃত হত।

অম্বিটি—এতে একটি লাউ এবং দুটি তার থাকে।

কিঙ্গিরা—বীণের মত, কিন্তু দুটি স্নায়ুনির্মিত তন্ত্রী এবং ছোট ছোট কয়েকটি লাউ থাকে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বাদ্য

পাখোয়াজ—মোটা কাঠ থেকে হরিতকীর মত আকৃতিতে তৈরি করা হয়। এর মাঝখানটা ফাঁপা থাকে। লম্বায় এক গজের কিছু বেশী। যদি এর মধ্যভাগ বগলের ভিতর দিয়ে ধরা যায় তা হলে দুই হাতের আঙুল একত্র মিলবে। এর মাথা দুটি কলসীর মুখের চেয়ে কিছু চওড়া হয়। এদের চামড়া দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়। এর চারি দিকে নাকাড়ার মত চামড়ার পাত টানা থাকে। চারটি কাঠের টুকরো একহাতের কিছু কম দূরে বাঁ দিকে পাখোয়াজের বৃন্তে লাগানো থাকে। এই কাঠের টুকরোগুলিকে মুচড়ে স্বর নামোনো চড়ানো হয়।

আওয়াজ—একটি ফাঁপা কাঠ থেকে তৈরি হয়। দুটি ছোট চর্মবাদ্যের মুখ একত্র করলে যেরকম হয় সেরকম।

দুহুল—এটি বিশেষ পরিচিত। আমরা একেই ঢোল বলি।

ঢাডা—এটি দুহুল বা ঢোলের মত কিন্তু খুব ছোট।

অর্ধাওয়াজ—আকৃতিতে আওয়াজ নামক যন্ত্রের অর্ধেক।

দফ্—এটি বিশেষ পরিচিত। একটি গোল ফ্রেমের একদিকে চামড়া ছাওয়া থাকে। বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে বাজানো হয়। বর্তমানে ডফ্ বলে। অনেক যন্ত্রে ধাতব চাকতিও থাকে।

খন্‌জর—এটিকে ছোট দফ্ বলা যায়। ভিতরে রণনাত্মক ঘণ্টি থাকে। এর মুখ কলসীর মুখের মত চওড়া।

তৃতীয় পর্যায়ের বাদ্য

তাল—মুখ দুটি সমান করে গঠন করা হয় ; বিস্তৃত ওষ্ঠযুক্ত পেয়ালার মত। অর্থাৎ এর কানাটি চওড়া হবে। আমাদের বর্তমান করতাল।

কাঠতাল—আকৃতিতে ছোট মাছের মত। চারটি করে থাকে। কাঠের বা পাথরের তৈরি।

চতুর্থ পর্যায়ের বাদ্য

শাহ্‌না—ফার্সীতে এটি সুর্ণা নামে পরিচিত। এটি আমাদের বর্তমান শানাই।

মশ্‌ক্—এতে দুটি ছোট বাঁশি থাকে এবং তাতে মাপ অনুসারে কয়েকটি ছিদ্র থাকে। এই বাঁশি দুটি মশ্‌ক্ অর্থাৎ চামড়ার থলিতে মিলিত হয়। ফার্সী ভাষায় একে নাই-ই-অম্বন (বাঁশরীযুক্ত থলি) বলে।

এটি ব্যাগ পাইপ নামে পরিচিত।

মুরলী—নাই-এর অনুরূপ। নাই শব্দের অর্থ হচ্ছে বাঁশি।

উপাঙ্গ্—একপ্রকার নাই বা বাঁশি। এর ভিতরটা ফাঁপা, লম্বায় এক গজ। এর উপরের দিকে মধ্যস্থলে একটি ফুটো থাকে। এই ফুটোর ভিতরে একটি সরু বাঁশি বসানো থাকে।

সপ্তম—নৃত্যাধ্যায়। এর বিষয়বস্তু বিভিন্ন প্রকার নৃত্য।

আবুল ফজল এর বর্ণনা দেননি।

গীতশিল্পীদের সংখ্যানিরূপণ

প্রাচীন গীতকলার (নক্‌শ্-ই-কদীম্) শিল্পীদের ভিন্ন ভিন্ন দেশ অনুসারে সম্প্রদায়গত প্রকারভেদ হয় না। এঁদের বলা হয় বৈকার (সংস্কৃত, বৈখরী)। এই গীতশিল্প যাঁরা শিক্ষা দেন তাঁদের বলা হয় সহকার।

কলাবন্ত—বর্তমানে সুপরিচিত। এঁরা ধ্রুপদ গান করেন।

ঢাডী—এই বাদ্যসহ গীতটি পাঞ্জাবে প্রচলিত। এতে ঢাডা এবং কিঙ্গিরা বাজানো হয়। প্রধানত যুদ্ধক্ষেত্রে বীরপুরুষদের প্রশংসায় এই সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়, যুদ্ধকালে এই সঙ্গীত উৎসাহ সঞ্চার করে। কওয়াল এই শ্রেণীর অন্তর্গত তবে এঁরা অধিকাংশ দিল্লী এবং জৌনপুরের চালে গান করেন। এর সঙ্গে ফার্সী ছন্দোবদ্ধ পদ (শায়ের) আবৃত্তি করা হয়।

হুরকিয়া—পুরুষগণ হুরুক বা আওয়াজ নামে পরিচিত উক্ত বাদ্য বাজান, স্ত্রীলোকেরা তালের দিকে লক্ষ্য রাখেন এবং গায়নবৈশিষ্ট্যও প্রদর্শন করেন। পূর্বে এঁরা করুকা নামক বাদ্যের সঙ্গে গাইতেন। বর্তমানে এঁরা ধ্রুপদ ও তজ্জাতীয় গান গেয়ে থাকেন। এই গোষ্ঠীর অধিকাংশ স্ত্রীলোক সুন্দরী এবং কৌশলাভিজ্ঞা ও বিদগ্ধা (হুনর্-পরদাজী) হয়ে থাকেন।

আবুল ফজল যাকে হুরুক বলেছেন সেটি হুড়ুক্কা নামক একটি চর্মবাদ্য। একে আওয়াজও বলা হত। সঙ্গীতরত্নাকর হুড়ুক্কার বর্ণনায় বলেছেন — লক্ষ্যজ্ঞাস্ত্বাবজং প্রাহুরিমাং স্কন্ধাবাজং তথা। অর্থাৎ অভিজ্ঞগণ এই বাদ্যকে আবজ (আওয়াজ) বা স্কন্ধ-আওয়াজ বলে থাকেন। করুকা শব্দটিকে সংস্কৃত সঙ্গীত-সাহিত্যে কুড়ুক্কা বলা হয়েছে। এটি হুড়ুক্কার অনুরূপ তবে এটি হুড়ুক্কার মত অর্গলবদ্ধ হত না। এর সঙ্গে সঙ্গতসহযোগে গান করা হত।

দফ্জন—ঢাডীর অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ স্ত্রীলোক এই শ্রেণীতেও বর্তমান। তাঁরা দফ্ ও দুহুল বাজান এবং ধ্রুপদগান করেন। বিবাহ উপলক্ষ্যে এঁরা সোহ্লা গান করেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার উপলক্ষ্যে এঁরা বিচিত্র প্রশংসা-সূচক (নকৃশ্) গীত রচনা করে কৃতিত্বের সঙ্গে গেয়ে থাকেন। পূর্বে কেবলমাত্র স্ত্রীসমাজেই এঁরা গাইতেন; বর্তমানে পুরুষদের মজলিসেও আসেন।

সেজ্দাতালী—এই গোষ্ঠীর পুরুষেরা বড় বড় দফ্ নিজেরা বাজান আর স্ত্রীলোকগণ এক পায়ের আঘাতে সেজ্দাতাল-এর (অর্থাৎ তেরটি তালযন্ত্রে) ঝঙ্কার তোলেন। এঁদের দুটি মণিবন্ধে দুটি তাল, দুই হাতের কনুইয়ে দুটি, দুই কাঁধের সন্ধিতে দুটি, দুই কাঁধে দুটি, বক্ষদেশে একটি, প্রত্যেক হাতের দুটি আঙুলে দুটি করে তাল বাঁধা থাকে। এঁরা প্রধানত গুজরাট এবং মালব অঞ্চলের বাসিন্দা।

এই অনুষ্ঠানের ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, মেয়েদের একটি পায়ের নিয়মিত আঘাতে একটি নৃত্যভঙ্গী প্রদর্শিত হত। পুরুষেরা দাঁড়িয়ে থাকতেন

আর মেয়েরা নিয়মিত পদক্ষেপে ধাতুনির্মিত করতালের ঝঞ্ঝনা উৎপন্ন করতেন।

নটুয়া—এঁরা চমৎকার নৃত্য প্রদর্শন করেন এবং মূলরূপের বিভিন্ন পদ্ধতি দেখিয়ে থাকেন। এঁরা গীতও সম্পাদন করেন। এঁদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে পাখোয়াজ, রবাব ও তাল বাজানো হয়।

কীর্তনীয়া—এঁরা উপবীত ধারণ করেন। এঁদের বাদ্যগুলি দাবেক ধরনের। এঁদের অনুষ্ঠানে মসৃণমুখযুক্ত ব্যক্তিদের স্ত্রীলোকের পোশাক পরিয়ে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও লীলা অভিনয় করানো হয়।

ভগ্তিয়া—এঁদের গীতানুষ্ঠান পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানের অনুরূপ; তবে এঁরা নানারকম বেশ ধরে চমৎকার অনুকরণ করতে পারেন। এঁদের অভিনয় রাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয়।

ভাদুইয়া—শেষোক্ত শ্রেণীর অনুরূপ। তবে এঁরা রাত্রিতে এবং দিবসে অনুষ্ঠান প্রদর্শন করেন। একটি চক্রাকার পাত্র (তবক্) যাকে হিন্দীতে থালী বলে তার পরিধির মধ্যে বসে দাঁড়িয়ে এঁরা নানারকম অনুষ্ঠান প্রদর্শন করেন, গান করেন আর চমৎকার কৌশল দেখান।

ভাণ্ড্ (ভাঁড়)—এঁরা দুহুল ও তাল বাজিয়ে থাকেন এবং গানও করেন। এঁরা মানুষ ও জানোয়ারের নকল করেন। এঁরা নৃত্য করেন এবং নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গীর সময় শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত করেন। রাস্তা থেকে জল নিয়ে এঁরা নাকে মুখে নিক্ষেপ করেন, একটি লোহার শিক মুখ থেকে জঠর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়ে দেন। কয়েকপ্রকার দানা একসঙ্গে গলাধঃকরণ করবার পর সেগুলি এঁরা আলাদা আলাদা করে বের করে দেন। এঁরা আরও নানাপ্রকার চমকপ্রদ কার্যাদি সম্পাদন করেন।

কন্জরী—এতে পুরুষেরা পাখোয়াজ, রবাব ও তাল বাজান এবং স্ত্রীলোকগণ গীত, নৃত্যানুষ্ঠান করেন। জগতের অধীশ্বর বাদশা আকবর এঁদের কাঞ্চনী বলে অভিহিত করেন।

নট—এঁরা দড়ির খেলা দেখান এবং বিস্ময়করভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় কৌশলাদি প্রদর্শন করেন। এঁরা তাল ও দুহুল বাজিয়ে থাকেন।

বহুরূপী—এঁরা প্রতিদিন নানা বেশ ধারণ করে উপস্থিত হন। যেমন, একজন যুবাপুরুষ সুন্দরভাবে বৃদ্ধের রূপ ধারণ করেন। বুদ্ধিমান পরীক্ষক এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষককেও এঁরা ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেন।

বাজীগর—এঁরা হাতের কৌশলে প্রশংসার সহিত ক্রীড়া প্রদর্শন করেন।

এঁদের বঞ্চনার প্রভাবে দৃষ্টিতে রূপের বৈলক্ষণ্য প্রতিভাত হয়। যেমন, একটি ভারি পাথর কাঁধে বহন করতে দেখা যায় অথচ ধরে নেই এমন হালকা বলে মনে হয়। এঁদের একজন লোককে খণ্ড খণ্ড করে কেটে আবার যথাযথ ভাবে গঠিত করতে দেখা যায়। এঁদের কৌশলচমৎকারিত্বের বর্ণনা দেওয়া সাধ্যাতীত। এঁরা প্রত্যেক ব্যাপারেই বিশেষ রীতির গান গেয়ে থাকেন।

আখারা—এটি একটি প্রমোদ পরিবেশক সমাজ। অভিজাত গৃহের অন্তঃপুরের সীমানাতেই এঁদের অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। কয়েকজন অন্তঃপুরের পরিচারক, পরিচারিকাকে গান বাজনা শেখানো হয়। এতে চারজন সুন্দরী স্ত্রীলোক নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন এবং চমৎকার ভাবে আসল নৃত্যের ভঙ্গী প্রদর্শন করেন। অপর চারজন সঙ্গীতে নিযুক্ত হন ও সহযোগী চারজন গানের রীতি অনুযায়ী তাল বাজান। অনুষ্ঠানে দুটি পাখোয়াজ ও দুটি উপাঙ্গ্ ব্যবহৃত হয়। এক একজন করে দক্ষিণী রবাব, বীণ ও যন্ত্র বাজান। উৎসবে ব্যবহৃত প্রদীপ ব্যতীত দুটি স্ত্রীলোক হাতে প্রদীপ ধরে এই শিল্পীচক্রের পরিধির নিকট দণ্ডায়মান থাকেন। এই সংখ্যার কিছু অধিকও এই অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অধিক ক্ষেত্রে নটুয়া গোষ্ঠীর সহযোগিতায় এই সমাজের পরিচালনা সম্পন্ন হয়। এঁরা তরুণী ক্রীতদাসীদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কখনো কখনো নটুয়ারা তাঁদের স্ত্রীলোকদের শিক্ষা দিয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের নিকট নিয়ে যান এবং অভীষ্ট পুরস্কার লাভ করেন।

এই বর্ণনায় রবাব-ই-দখন্ বা দক্ষিণের রবাব সম্বন্ধে আলোকপাত করা শক্ত, কেন না দক্ষিণদেশীয় রবাবের উল্লেখ দেখা যায় না। মূল মুদ্রিত গ্রন্থে দেখা যায় এই শব্দের পাঠ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। ফুটনোটে রবাব ও ঘন্ বা রবাব ও ধোলক (ঢোলক)—এই দুটি পাঠান্তর দেওয়া আছে।

সঙ্গীতাধ্যায়ের সমাপ্তিতে আবুল ফজল বলছেন যে, জগতের অধীশ্বর (বাদশা আকবর) সঙ্গীতের বর্ণিত বিষয় ছাড়াও বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞ। যে সঙ্গীত পৃথিবীর ধনী ব্যক্তিদের নিদ্রাকর্ষণের জন্য নিয়োজিত হয় তা বাদশার বিশেষ কৌতূহল উদ্রেক করে।

আইন-ই-আকবরীর যে অংশে রাজকীয় সম্ভ্রমচিহ্নাদির বর্ণনা করা হয়েছে সেখান থেকেও জানা যায় যে, আকবর পারসীক সঙ্গীতেও অভিজ্ঞ ছিলেন এবং দুইশতাধিক সঙ্গীত রচনা করেছিলেন খোরাসমীয় (Khwarazm) রীতিতে। এর মধ্যে জলালশাহী, মহামীর করকৎ ও

নওরোজী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। আকবরের দরবারে ভারতীয় শিল্পী ব্যতীত ইরান, তুরান অঞ্চলের অনেক শিল্পীও তাঁদের গুণপনার পরিচয় দিতেন। আকবরের জীবিতকালে প্রাচ্য ভূখণ্ডের বহু অঞ্চলের সঙ্গে এইভাবে ভারতীয় সঙ্গীতের যোগ স্থাপিত হয়েছিল এবং ভারতীয় সঙ্গীত নানাদিক থেকে সমৃদ্ধিলাভ করেছিল।

[এসিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত ফার্সী আইন-ই-আকবরীকে আদর্শ করে এই সটীক তর্জমা করা হয়েছে।]

রাগদর্পণ

ফকীর উল্লাহ্

গ্রন্থকার ফকীর উল্লাহ্

ঔরঙ্গজীবের শাসনকালে সঙ্গীত সর্বাপেক্ষা অবহেলিত হয়েছে এ কথা আমাদের জানা ; কিন্তু তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকের দুটি গ্রন্থে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে সমগ্র মুঘলযুগে তেমন হয়নি। এই দুটি গ্রন্থের একটি হচ্ছে রাগদর্পণ, অপরটি মীর্জা খাঁ-রচিত তুহ্ফাৎ-উল্-হিন্দ্। দ্বিতীয় গ্রন্থটি সম্পূর্ণ সঙ্গীত বিষয়ক নয়, সাধারণ সংস্কৃতি বিষয়ক তথাপি এর সঙ্গীত অধ্যায়টি বহু প্রয়োজনীয় তথ্যে সমৃদ্ধ।

রাগদর্পণকার ফকীর উল্লাহ্ ঔরঙ্গজীবের রাজত্বে এই গ্রন্থটি রচনা করলেও আসলে তিনি শাহ্জাহানের আমলের লোক। শাহ্জাহানের দরবারেই তিনি বর্ধিত হয়েছেন। মনোভাবের দিক দিয়ে ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে তাঁর আদৌ মিল ছিল না ; কিন্তু এই সঙ্গীতবিদ্বেষী বাদশাকে তিনি তাঁর গ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বাদশাকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন যেন এই গ্রন্থটি তিনি স্বয়ং খুৎবা পড়ে ঘোষণা করেন। ঔরঙ্গজীবের মত দুর্ধর্ষ কঠোরব্যক্তিত্বসম্পন্ন সম্রাটকে এই রকম অনুরোধ করার মত সাহস কম লোকেরই ছিল। ফকীর উল্লাহ্ এই সাহস সঞ্চয় করেছিলেন কেন না ঔরঙ্গজীবকে সিংহাসন প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে তিনি প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। এই কৃতজ্ঞতা বশতই ঔরঙ্গজীব বহু ঔদ্ধত্য সত্ত্বেও তাঁকে ক্ষমা করে গেছেন। ঔরঙ্গজীবের রাজত্বে ফকীর উল্লাহ্ সামান্য লোক ছিলেন না।

রাগদর্পণ গ্রন্থে ফকীর উল্লাহ্ নিজের সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেছেন বটে কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটিত করেননি। এমনকি সে যুগে তাঁর পরিচিত উপাধিটিও গোপন করেছেন। এই গ্রন্থ পড়লে মনে হবে ফকীর উল্লাহ একজন সুবেদার ছিলেন এবং সঙ্গীতের প্রতি ছিল তাঁর অসামান্য আসক্তি। এই গোপনতার কারণ অনুসন্ধান করে মনে হয় বৈষয়িক উন্নতির জন্য যে সব বিবেকবিরুদ্ধ কাজ বা পাপাচারণ তাঁকে করতে হয়েছে সেগুলি তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত থাকে এ তিনি চাননি ; তিনি চেয়েছিলেন বিদ্বান ব্যক্তি হিসাবেই তাঁর নাম পরিচিত থাকুক। সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবেই তিনি এই গ্রন্থে তাঁর স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তথাপি গিলগিটের দিকে অভিযানের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তাতে তাঁর স্বভাবের নিষ্ঠুরতাকে একেবারে বর্জন করতে পারেননি। যুদ্ধ এবং শান্তি—এই দুইয়ের আকর্ষণ বার বারই তাঁকে বিভ্রান্ত করেছে। আমীরী ছেড়ে মাঝে

মাঝে তিনি ফকীরীতে আত্মগোপন করেছেন এ রকম ঘটনা তাঁর জীবনে কয়েকবারই ঘটেছে।

ফকীর উল্লাহ্ ছিলেন তরবীয়ৎ খাঁ ফখরুদ্দীন্ আহ্মদ্ বখ্শীর দ্বিতীয় পুত্র। ফখরুদ্দীন্ জাহাঙ্গীরের সময় তুরান থেকে ভারতবর্ষে আসেন। শাহ্জাহান সম্রাট হবার পর তিনি তরবীয়ৎ খাঁ উপাধি লাভ করেন। শাহ্জাহানের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে তিনি রাষ্ট্রদূত হিসাবে তুরানে প্রেরিত হন। আরও আট বৎসর পরে তিনি কাশ্মীরের শাসক নিযুক্ত হন। তর্বীয়ৎ খাঁর দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ মীর্জা মুহম্মদ্ আফজল নিপুণ অশ্বারোহী এবং তীরন্দাজ ছিলেন। তিনি সামাজিক আদব কায়দায় দক্ষ এবং পত্ররচনায় কুশলী ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র ফকীর উল্লাহ্ শাহ্জাহানের দরবারে নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকতেন। এই কারণে তিনি শাহ্জাহানের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তরবীয়ৎ খাঁর পরিবার বিদ্যা এবং বীর্য এই দুদিকেই সম্পন্ন ছিল। দুই গুণপনায় সমান অধিকার থাকাতে ফকীর উল্লাহ্ বিবিধ পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতেন। শাহ্জাহানের রাজত্বের ত্রিংশৎ বৎসরে ফকীর উল্লাহ্ কুর্খানার (অস্ত্রাগার) অধিকর্তা নিযুক্ত হন এবং সাতশ সৈন্য ও একশ অশ্বের মনসবদারী প্রাপ্ত হন।

ঔরঙ্গজীব যখন দিল্লীর সিংহাসনের জন্য লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন তখন প্রচুর সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাজা যশোবন্ত সিংকে মালবে পাঠানো হল তাঁর গতিরোধের উদ্দেশ্যে। যুদ্ধে যখন বড় বড় সমরনায়কগণ মৃত্যুবরণ করলেন তখন রাজা যশোবন্ত সিংহের রণস্থল পরিত্যাগ করা ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না। এই সময় অনেকে শাহ্জাহানের পক্ষ পরিত্যাগ করে ঔরঙ্গজীবের পক্ষ অবলম্বন করেন। ফকীর উল্লাহ্ ছিলেন এঁদের একজন। তিনি ঔরঙ্গজীবের শরণাপন্ন হলেন। ঔরঙ্গজীব তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং দেড়হাজারী মনসব প্রদান করলেন। তাঁর উপাধি হল সাইফ্ খাঁ। এর পর থেকে যখনই তাঁর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তখনই সাইফ্ খাঁ বলা হয়েছে। এই নামেই তিনি মুঘল ইতিহাসে পরিচিত। সাইফ্ খাঁ ফকীর উল্লাহ্র সুবিধাবাদী নীতির প্রথম দৃষ্টান্ত, শাহ্জাহানের দরবারে মানুষ হয়ে তিনি নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অপরপক্ষে যোগদান করতে কিছুমাত্র ইতস্তত: করলেন না। দারা শিকোর সঙ্গে যুদ্ধেও তিনি বীরত্ব প্রকাশ করেছিলেন। এই সময় তিনি দেহরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন। শুজার সঙ্গে খাজোয়ার যুদ্ধে (১৬৫৯) রাজা যশোবন্ত সিং দক্ষিণ ভাগের পরিচালনায়

নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যুদ্ধ করলেন না। তাঁর স্থানে পিছন থেকে ইসলাম খাঁকে নিয়ে আসা হল এবং পশ্চাদ্ভাগ রক্ষায় সাইফ্ খাঁ ফকীর্ উল্লাহ্ এবং ইক্রম খাঁ নিযুক্ত হলেন। যুদ্ধের চরম অবস্থায় গোলার আওয়াজে বিভ্রান্ত হয়ে ইসলাম খাঁর হাতি হঠাৎ বেগে পলায়ন করতে আরম্ভ করল। সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় সাইফ্ খাঁ ফকীর উল্লাহ্ এবং ইক্রম খাঁ অসীম সাহসে তাঁদের স্থান দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে অমিত পরাক্রমে শত্রুর গতিরোধ করে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজীব তাঁদের সাহায্যার্থে সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসে পৌঁছে গেলেন। এই সময় থেকেই যুদ্ধের গতি ফিরে গেল এবং শুজা সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন। বলতে গেলে ফকীর উল্লাহ্ এবং ইক্রম খাঁর বীরত্বেই যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হয়েছিল নতুবা ঔরঙ্গজীবের পক্ষে দিল্লীর মসনদে বসা হয়ত ঘটে উঠত না। জয়লাভের পর যে পুরস্কার মিলল তাতে ফকীর উল্লাহ্ সম্ভবত খুশী হননি; তিনি কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে রইলেন। কিছুকাল সৈনিক বৃত্তি থেকে নিবৃত্ত থাকবার পর তিনি আবার কাজে যোগ দিলেন। এবারে তাঁকে আড়াই হাজারী মনসব প্রদান করা হল।

দারা এবং তাঁর পুত্র সিপিহর্ শিকোহ্কে বন্দী করে আনবার পর দারার মৃত্যুদণ্ড বিধান করা হয় (১৬৫৯, ৩০শে আগস্ট)। ক্রীতদাস নজর বেগ দারার হত্যাসাধন করে এবং হত্যাকাণ্ড নিষ্পন্ন করবার ভার অর্পণ করা হয় সাইফ্ খাঁ ফকীর উল্লাহ্র উপর। কার্য সম্পন্ন করে পরদিন তিনি সিপিহর্কে গোয়ালিয়র দুর্গে কর্মচারীদের হস্তে সমর্পণ করেন। তারপর তিনি আগ্রার সুবেদার নিযুক্ত হন। এইখানে ফকীর উল্লাহ্র চরিত্রের আর একটি নির্মমতার নিদর্শন মেলে। শাহ্জাহানের দরবারে একজন সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে দারার সঙ্গে তাঁর নিশ্চিত পরিচয় ছিল। যে মার্জিতরুচি যুবরাজকে তিনি প্রতিদিন মাথা নত করে প্রণতি জানিয়েছেন তাঁর দেহকে মস্তকচ্যুত করবার ভার তিনি অনায়াসে গ্রহণ করলেন এবং যে সম্রাটের দয়ায় তিনি দরবারে স্থান পেয়েছিলেন তিনি আগ্রাতে বন্দী থাকা সত্ত্বেও আগ্রার সুবেদার হতে তাঁর দ্বিধা হল না। বস্তুত সে যুগে এইগুলিই ছিল স্বার্থসিদ্ধির উপায়। সুযোগ যে ভাবেই আসুক না কেন তাকে কেউ প্রত্যাখ্যান করত না।

'মা-আসির-উল্-উমারায়' বলা হয়েছে যে, সাইফ্ খাঁ ফকীর উল্লাহ্ উগ্র মেজাজের লোক ছিলেন। তাঁর কৃতিত্বের গৌরবে তিনি যথেষ্ট উদ্ধত হয়ে উঠেছিলেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তিনি মান্য করে চলতেন না। এমনকি

সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করতেও তিনি ইতস্ততঃ করতেন না। কোন কারণে এই সময় তাঁকে পদচ্যুত করা হয় এবং তিনি সিরহিন্দে আত্মগোপন করেন। এই সময়ে তিনি রাজা মানের নির্দেশে রচিত 'মানকুতূহল' গ্রন্থটির খোঁজ পান। এ বিষয়ে তিনি গ্রন্থে লিখেছেন। ১৬৬২ সালের ১২ই মে তিনি মার্জনা লাভ করে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এইবার তিনি দুহাজারী মনসব্ লাভ করলেন।

ঔরঙ্গজীব যখন তাঁর রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে কঠিন রোগ থেকে আরোগ্যলাভ করে কাশ্মীর ভ্রমণে যান তখন সাইফ্ খাঁ ফকীর উল্লাহ্ কাশ্মীরের সুবেদার নিযুক্ত হন। তাঁর পিতাও কাশ্মীর শাসন করেছিলেন এবং এই প্রদেশের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকাল ধরে পরিচয় ছিল।

কাশ্মীরশাসনে নিযুক্ত হবার পর সাইফ্ খাঁ ফকীর উল্লাহ্ গিলগিট এবং বরশাল্ অধিকার করেন। গিলগিটকে গ্রন্থে গুলগস্ত্ বলা হয়েছে। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে এই অভিযানের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই অভিযান শেষ হবার পর ১৬৬৬ সালে সাইফ্ খাঁ ফকীর উল্লাহ্ রাগদর্পণ গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের নবম বর্ষে ফকীর উল্লাহ্ মুলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। দশম বর্ষে উক্ত সুবেদারী থেকে তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং তিনি দরবারে ফিরে আসেন।

১৬৬৯ সালের মে মাসে তিনি আবার কাশ্মীরে সুবেদারী লাভ করেন। কিন্তু ১৬৭১ সালে তিনি নির্জনবাস অবলম্বন করায় তাঁর পদগৌরব প্রত্যাহার করা হয়। ১৬৭২ সালের মে মাসে তিনি আবার ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং পূর্বপদে নিযুক্ত হন। মা-আসির-উল্-উমারা তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন যে, তিনি স্বভাবতই অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্য এত ভাল ছিল যে, যে কাজেই তিনি হাত দিয়েছেন তাতেই কৃতকার্য হয়েছেন। ঔরঙ্গজীব নিজে সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন কিন্তু অপরের মধ্যে সন্দিগ্ধভাব লক্ষ্য করলে সেটা সহ্য করতেন না। এমনকি সামান্য স্বাধীনতার প্রয়াস লক্ষ্য করলেই তিনি পুরাতন বা নূতন যে কোনও কর্মচারীকে পদচ্যুত করতেন। সাইফ্ খাঁ ফকীর উল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে তাঁকে পদচ্যুত করা হলেও সেই অবস্থায় তাঁকে রেখে দেওয়া হত না। কিছুকাল পরে তিনি আবার পদগৌরব ফিরে পেতেন। সাইফ্ খাঁ যদি এইরকম অব্যবস্থিতচিত্ত এবং উচ্ছৃঙ্খল না হতেন তা হলে তিনি হয়ত আমীরদের মধ্যে পদমর্যাদায় শীর্ষস্থান অধিকার করতেন।

কিছুকাল সম্রাটের অনুগ্রহলাভের পর তিনি আবার কাজে ইস্তফা দেন। ১৬৭৫ সালের ৯ই ডিসেম্বর নির্জনবাস থেকে ফিরে এসে তিনি আবার তাঁর উপাধি, তরবারি এবং মনসব্ লাভ করেন। ১৬৭৭ সালে তিনি বিহারের সুবেদার নিযুক্ত হন। মা-আসির্-ই-আলমগীরী নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বিহারের কোষাগার থেকে সম্রাটের বিনা অনুমতিতে ছাপ্পান্ন হাজার টাকা গ্রহণ করবার অভিযোগে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। ১৬৮৩ সালের ৮ই মার্চ সাইফ্ খাঁ ফকীর উল্লাহ্ দরবারে পৌঁছোলেন কিন্তু সম্রাটের দর্শন মিলল না। সরকারী আদেশ অনুযায়ী মুঘল খাঁ তাঁকে বাহরামন্দ খাঁর রক্ষীগৃহে আটক করে রাখেন। এপ্রিল মাসের তিন তারিখে সেই টাকা প্রত্যর্পণ করবার পর তিনি মুক্তিলাভ করেন।

এর পরে তিনি এলাহাবাদের সুবেদার নিযুক্ত হন। ১৬৮৪ সালের ২৬শে আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

সাইফ্ খাঁ ফকীর উল্লাহ্ সির্‌হিন্দের কাছে বাস করতেন। তাঁর বাসস্থান অনুসারে এই জায়গার নাম ছিল সাইফাবাদ। তাঁর বাসভূমিতেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর পুত্রও ঔরঙ্গজীবের রাজত্বের শেষভাগে পিতার উপাধি লাভ করেছিলেন।

ফকীর উল্লাহ্ বিচিত্র স্বভাবের লোক ছিলন। তিনি যোদ্ধা হলেও আসলে ছিলেন শিল্পী। তাই বারেবারেই শাসনকার্য তাঁর কাছে বিরক্তিকর ঠেকেছে। ফকীর দরবেশের প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ ছিল। নানা কাজে তাঁকে প্রচণ্ড স্বার্থপর মনে হলেও তাঁর অন্তরে একটা বৈরাগ্যের ভাবও ছিল নতুবা মাঝে মাঝে কাজে ইস্তফা দিয়ে নির্জনবাস অবলম্বন করতেন না। রাগদর্পণ গ্রন্থে তাঁর কবিস্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বহু কাব্যের উদ্ধৃতি এবং মানবিক অনুভূতিতে গ্রন্থটি সমুজ্জ্বল। তাঁর রচনায় মাঝে মাঝে হিন্দু-বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু তার অনেকখানি বাদশা ঔরঙ্গজীবকে খুশী করবার জন্য। প্রকৃত হিন্দুবিদ্বেষী হলে তিনি রাজা মানের রচিত গ্রন্থে হিন্দুসঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করতেন না। ঔরঙ্গজীব তাঁর গ্রন্থপ্রচারে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন কিনা সন্দেহ কিন্তু সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকত্ব ব্যতিরেকেও রাগদর্পণ পণ্ডিতমহলে পঠিত হয়ে এসেছে এবং প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতিলাভও করেছে।

গ্রন্থবিবরণ

রাগদর্পণ গ্রন্থটি গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তোমরের রচনা 'মানকুতূহল' গ্রন্থের অনুবাদ এবং এর সঙ্গে ফকীর উল্লাহ্ মুঘলযুগের সঙ্গীতের বিশেষ বিবরণও দিয়েছেন। গোয়ালিয়র প্রায় ১৩৯৮ সাল পর্যন্ত মুসলমান শাসনে ছিল। তার পরে তোমর বংশীয় রাজপুতগণ গোয়ালিয়র দখল করেন এবং ১৫১৮ সাল পর্যন্ত গোয়ালিয়র তাঁদের দখলে ছিল। অতঃপর ইব্রাহিম লোদী গোয়ালিয়র দুর্গ দখল করেন। তোমর বংশীয় শাসনে গোয়ালিয়র বিশেষ বিখ্যাত হয় এবং রাজা মানসিংহ তাঁর দীর্ঘ রাজত্বে (১৪৮৬—১৫১৭) এই খ্যাতি সমধিক বিস্তৃত করেন। রাজা মানের গুর্জরী রানী মৃগনয়নীর আনুকূল্যে বহু গুণী সঙ্গীতজ্ঞ গোয়ালিয়রে সঙ্গীতচর্চার সুযোগ পান এবং অনেক শিল্পী এখান থেকে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এর মধ্যে তানসেনও ছিলেন। কথিত আছে এঁদের মধ্যে পনেরো জন গুণী শিল্পী আকবরের দরবার অলঙ্কৃত করেছিলেন।

রাগদর্পণে দশটি অধ্যায় আছে। এর মধ্যে ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম অধ্যায় প্রধানত শার্ঙ্গদেব প্রণীত 'সঙ্গীতরত্নাকর' থেকে সঙ্কলিত। নবম অধ্যায়ে বৃন্দসম্বন্ধীয় নিয়মাবলীও উক্ত গ্রন্থ থেকেই নেওয়া হয়েছে। স্বর এবং বাদ্য অধ্যায় আইন-ই- আকবরী থেকে সংগৃহীত, যদিচ ফকীর উল্লাহ্ এই ঋণের কথা উল্লেখ করেননি। বাদ্যাধ্যায়ে কিছু বিশেষ বর্ণনা থাকলেও আইন-ই-আকবরীর বর্ণনাই প্রধান। এমনকি উক্ত গ্রন্থের ভাষা পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, কেন না এই অধ্যায় থেকেই মুঘলযুগের প্রচলিত গীতসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়। ফকীর উল্লাহ্ ধ্রুপদের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন এবং ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে এই গীত প্রচলিত ছিল তারও সীমানা নির্দেশ করেছেন। আমীর খুস্‌রও সম্পর্কে তিনি যে "ডাণ্ডী"র উল্লেখ করেছেন সেটি চিত্তাকর্ষক। এইরকম কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, খুস্‌রও সেতারের আবিষ্কর্তা। আসলে সেতার তাঁর আবিষ্কার ছিল না। সেতার একপ্রকার বীণা। মুঘলযুগে একে বলা হত বীন্-সেহ্‌তার। ফকীর উল্লাহ্‌র সময়ে খেয়াল এবং টপ্পা বেশ ভালভাবেই প্রচলিত ছিল এ খবরও এই গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। বর্তমানে তরানা এবং তেলেনার মধ্যে প্রভেদ দেখা যায় না কিন্তু এই গ্রন্থ অনুসারে জানা যায় যে,

তরানায় কিছু কাব্যাংশ যোজিত হত কিন্তু তেলেনায় কেবলমাত্র কয়েকটি অর্থহীন শব্দ থাকত। রবাব যে চুটকলা এবং খেয়ালের সঙ্গে বাজানো হত সেটিও এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। চুটকলা গান মুঘল আমলে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। বাংলাতেও এর জনপ্রিয়তার উল্লেখ বিবিধ গ্রন্থে পাওয়া যায়। জলতরঙ্গ যে ভারতবর্ষে বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে গ্রন্থের এই সংবাদটিও চিত্তাকর্ষক। নায়ক বখ্‌শুর একটি গীত উদ্ধৃত করে দেখান হয়েছে যে তিনি কাব্য এবং অলঙ্কারে আগ্রহসম্পন্ন ছিলেন।

নবম অধ্যায়ে ফকীর উল্লাহ্ মুঘলযুগের সঙ্গীত সম্বন্ধে যে নির্ভীক সমালোচনা করেছেন তাতে তাঁর স্বাধীনচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আকবরের যুগে গায়কদের যে উচ্চ আসন দেওয়া হয়েছে তার যোগ্যতা তাঁদের ছিল না এ কথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন। তাঁরা যে যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন না এবং কেবলমাত্র যা শিখেছিলেন তাই গাইতেন এটিও তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন। এঁদের সঙ্গীতরচনা বা গায়নশিল্পে দক্ষতা থাকলেও পূর্ব যুগের নায়কদের সঙ্গে এক আসনে বসবার যোগ্যতা ছিল না। আকবরের সময়ে লিপিবদ্ধ 'রাগসাগর'কেও ফকীর উল্লাহ্ মেনে নেননি, কেন না এই গ্রন্থ যাঁদের নির্দেশে লিখিত হয়েছে তাঁদের জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর প্রভূত সন্দেহ ছিল। এই সমালোচক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রন্থের সর্বত্রই পাওয়া যায়।

ফকীর উল্লাহ্ ঔরঙ্গজীবের আমলের যে কয়েকজন শিল্পীর উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে খুশ্‌হাল খাঁ ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তিনি একজন সঙ্গীতশিল্পীর উল্লেখ করেননি। ইনি হচ্ছেন বিশ্রাম খাঁ। মা-আসীর-ই-আলমগীরীতে এঁর উল্লেখ আছে। ফকীর উল্লাহ্ রাগদর্পণ রচনা শেষ করেন ১৬৬৬ সালে। তখন তিনি কাশ্মীরে থাকায় দরবারের খবর যথাযথভাবে পেতেন না। ১৬৬৮ সাল থেকে ঔরঙ্গজীব সঙ্গীতে উৎসাহের অভাব প্রকাশ করেন। ওই বৎসরে তিনি খুশ্‌হাল খাঁ, বিশ্রাম খাঁ, রসবীণ প্রভৃতি প্রধান সঙ্গীতজ্ঞদের আদেশ করেন যে তাঁরা দরবারে এলেও গান গাইতে পারবেন না। ক্রমে সঙ্গীত একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া হল। তথাপি আশ্রিত সঙ্গীতজ্ঞদের প্রতি তাঁর কৃপার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৬৬৮ সালের ২১শে অক্টোবর খুশ্‌হাল খাঁ এবং অন্যান্য প্রধান গুণীদের তিন হাজার টাকা এবং চল্লিশটি পোশাক খেলাৎ স্বরূপ প্রদান করা হয়। ১৬৭১ সালের ১০ই এপ্রিল প্রধান সঙ্গীতজ্ঞ বিশ্রাম খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র ভূপৎ এবং খুশ্‌হাল খাঁকে পরিচ্ছদ উপহার দেওয়া হয়। প্রকৃত পক্ষে ফকীর উল্লাহ্

যে সময়ে তাঁর গ্রন্থ ঔরঙ্গজীবকে উৎসর্গ করেছিলেন সেই সময়ে সঙ্গীত সম্বন্ধে অনুরাগ তাঁর কমে এসেছে। এই গ্রন্থ পেয়ে ঔরঙ্গজীব কী মত প্রকাশ করেছিলেন বা আদৌ এই গ্রন্থ তাঁর হাতে পৌঁছেছিল কিনা সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। সম্ভবত এই গ্রন্থ রাজদরবারে বিশেষ উৎসাহ পায়নি। পেলে তার উল্লেখ থাকত।

ফকীর উল্লাহ্ তাঁর গ্রন্থে বহু ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন—আমীর খুস্রও, শেখ বাহাউদ্দীন জ্যাকেরিয়া মুলতানী, সুলতান হুসেন শর্কী, আভিসিন্না, কাজী মুহম্মদ গুজরাতিয়ৎ, এবং খাজা মুহম্মদ সলাহ্ সল্মিয়া। এঁদের বিষয়ে গ্রন্থেই কিছু কিছু বলা হয়েছে। আভিসিন্না (আবু আলী ইব্ন্ সিনা) ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান আফগান সীমান্তে অবস্থিত বাল্খ্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বুখারায় বহু বিদ্যার চর্চা করেছিলেন। অল্প বয়সে তিনি বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। চিকিৎসাবিদ্যায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। গণিতেও তাঁর আশ্চর্য দখল ছিল। কিতাব-অল্-শিফা তাঁর প্রধান গ্রন্থ। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের হার্মনি সম্বন্ধে তিনি চিন্তা করেছিলেন বলে জানা যায়। ১০৭১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। শেখ বাহাউদ্দীন জ্যাকেরিয়া মুলতানীর নাম মুসলমান সাহিত্যে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। এঁর পিতামহ মক্কার অধিবাসী ছিলেন। ৫৭৮ হিজরীতে ভারতে তাঁর জন্ম হয়। অল্প বয়সে তিনি প্রভূত বিদ্যা অর্জন করেন। তিনি খোরাসান এবং বুখারায় বিদ্যা চর্চা করে বাগদাদে আসেন। এখানে শেখ ওমর শাহাবুদ্দীন সেহ্রওয়ার্দীর শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। পরবর্তী জীবন তিনি ফকীরের মত কাটিয়েছেন। তিনি মুলতানে থাকতেন। সুলতান ইলতুতমিস্ তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। ৬৬৬ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বহু অলৌকিক ক্ষমতার কথা বর্ণিত আছে কিন্তু সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর জ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। মুসলমান শাস্ত্রকারদের কতিপয় উল্লেখ থেকে জানা যায় সঙ্গীতেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল এবং ফকীর হলেও সঙ্গীতে তিনি বীতস্পৃহ ছিলেন না।

রাগদর্পণে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি হল—ভরতসঙ্গীত, সঙ্গীতদর্পণ, রাগসাগর, সঙ্গীতরত্নাকর, রাগপ্রকাশ, রিসালা-ই-সইদ্ মনসুর, সঙ্গীতবল্লভ এবং এল্ম্-ই-মৌসিকী।

ভরতসঙ্গীত গ্রন্থটি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত নয়। এটি সম্পূর্ণ অন্য গ্রন্থ। এটি মুসলমান শাসনকালে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

সঙ্গীতরত্নাকর ১২৩০ খ্রীষ্টাব্দে শার্ঙ্গদেব কর্তৃক দেবগিরিতে রচিত হয়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের পর এই গ্রন্থের চেয়ে প্রামাণিক আর কোনও গ্রন্থ রচিত হয়নি। সঙ্গীতদর্পণ আনুমানিক ১৬৩০ সালে রচিত হয়। এটিকে একটি সঙ্কলন গ্রন্থ বলা উচিত। গ্রন্থকার দামোদর মহারাষ্ট্রীয় ছিলেন। রাগসাগর গ্রন্থটি আকবরের সময় লিপিবদ্ধ হয় এই সংবাদ ফকীর উল্লাহ্ তদীয় গ্রন্থে জানিয়েছেন। বর্তমানে এই গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। অপরাপর গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে তথ্যের অভাবে আলোকপাত করা গেল না।

রাগদর্পণ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মিশ্ররাগ সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রসঙ্গে দুটি রাগ যুক্ত হলে কিভাবে কোনটির প্রাধান্য দিতে হবে তার একটি স্পষ্ট আলোচনা প্রদান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বহু রাগের মিশ্রণে কিভাবে রসসৃষ্টি হতে পারে সে সম্বন্ধেও লেখক তাঁর অভিমত জানিয়েছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের বর্ণনা থেকে জানা যায় লেখকের সময় চৈত্রমাস থেকে বৎসর আরম্ভ হত এবং ঋতুবিভাগগুলিও অনুরূপভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ধ্রুপদের প্রসঙ্গে গুবর্হার, ডাগর, খাণ্ডার এবং নওহার—এই বাণীগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। অনুমান হয় লেখকের সময় এই সব বাণীর আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল না। পঞ্চম অধ্যায়ে বিভিন্ন নায়িকার বর্ণনা থেকে মনে হয় মধ্যযুগে বিভিন্ন পরিবেশে অবস্থিত নায়িকাদের অবলম্বন করে গীত রচিত হত। বৈষ্ণব পদাবলী থেকেই এই রীতির উদ্ভব হয়েছে বলে মনে হয়। দশম অধ্যায়টি এই গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক অধ্যায়। সেকালকার বড় বড় ওস্তাদের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের কথা বলা হয়েছে। তিনি প্রচুর পরিশ্রম করে তাবৎ ওস্তাদের নাম এবং পরিচয় সংগ্রহ করেছেন। এঁদের সম্বন্ধেও কোথাও কোন বাহুল্য নেই। তাঁদের দোষগুণ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এই তথ্যগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। এই অধ্যায়ের শেষ অংশ থেকে জানা যায় তখনও ঠুংরী প্রচলিত ছিল এবং ঠুংরী আসলে বারোঁয়ারই রূপান্তর। এই গ্রন্থ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, খেয়াল, টপ্পা এবং ঠুংরী—এই সবকটি গীতরূপই মুঘল আমল থেকে চলে আসছে। কোনটির ঐতিহ্যই মুঘলযুগের পরবর্তী কালের নয়। ঔরঙ্গজীবের ব্যক্তিগত জীবন এমনকি তাঁর কবিতা রচনার কৌতুহলোদ্দীপক বিবরণও এই অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

সাইফ খাঁ ফকীর উল্লাহ্র ফার্সী অনুবাদে তাঁর মত এবং তৎকালীন সাঙ্গীতিক তথ্য প্রবিষ্ট হয়েছে। তিনি অবশ্য এ কথা বলেছেন যে তিনি বিশ্বস্তভাবেই মূল গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। যাই হোক, গ্রন্থটিতে ফকীর

উল্লাহ্‌র নিজস্ব রচনা বহুল পরিমাণেই আছে এবং তাঁর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ রক্ষিত আছে।

গ্রন্থের লেখনরীতি সুন্দর। ফার্সী ভাষায় তাঁর দখল ছিল এবং ফার্সী সাহিত্য তাঁর ভালভাবেই পড়া ছিল। স্থানে স্থানে কবিতার উদ্ধৃতিতে গ্রন্থটি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। তিনি নিজেও গায়ক ছিলেন এবং কয়েকটি রাগের উদ্ভাবন করেছিলেন। গ্রন্থে এগুলির উল্লেখ আছে। গ্রন্থের ভাষায় মুঘলযুগের শেষ আমলের উর্দুর কিঞ্চিৎ পরিচয়ও পাওয়া যায়। হিন্দী এবং উর্দুতে ব্যবহৃত সব বর্ণই ফকীর উল্লাহ ব্যবহার করেছেন। এ সম্পর্কে যাঁদের আগ্রহ আছে তাঁরা বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত জিয়াউদ্দীন রচিত 'Mirza Khan's Grammar of the Braj Bhaka' গ্রন্থের ভূমিকায় "The Scheme of Transliteration" অংশটি দেখতে পারেন।

গ্রন্থটির কোন অংশই সেকালকার রচনার মত উচ্ছ্বাসের আধিক্যে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠেনি। অপ্রয়োজনীয় বস্তু কিছুই এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়নি। তবে অপর সম্প্রদায়ের প্রতি বিরুদ্ধ ইঙ্গিতের পরিমাণ হ্রাস করলে গ্রন্থের গৌরব বর্ধিত হত।

এই অনুবাদ এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিকে আদর্শ করে করা হয়েছে। পুঁথিটি সুবোধ্য নাস্তালিকে লিখিত। অনুবাদ উপলক্ষ্যে মৌলভী মোতিওর্‌ রহমান সাহেবের নিকট প্রভূত সাহায্যলাভ করেছি। উক্ত সোসাইটির গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবদাস চৌধুরী মহাশয়ের নিকটেও নানা ব্যাপারে উপকৃত হয়েছি।

রাগদর্পণ

এই গ্রন্থে দশটি অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়—প্রস্তাবনা; দ্বিতীয় অধ্যায়—রাগসম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়; তৃতীয় অধ্যায়—মৌসুম নির্ণয়, ঋতু অনুসারে গ্রাম, রাগ ও রাগিণীর গায়ন, নিষিদ্ধ হরফ নির্ধারণ, গণতত্ত্ব ও গ্রামসমূহের কাল নির্ধারণ; চতুর্থ অধ্যায়—স্বরসম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য তথ্য ও বিবিধ নিবদ্ধ গীতরূপের বিবরণ; পঞ্চম অধ্যায়—বাদ্যাদি, নায়ক, নায়িকা ও নর্তকী সম্বন্ধীয় বিবরণ; ষষ্ঠ অধ্যায়—গায়কের দোষ; সপ্তম অধ্যায়—আওয়াজ-সমূহের সনাক্তকরণ ও কণ্ঠসম্বন্ধীয় তথ্য; অষ্টম অধ্যায়—গায়ক কিভাবে সাফল্য অর্জনে সমর্থ হন তার বিবরণ; নবম অধ্যায়—বৃন্দসম্বন্ধীয় তথ্য এবং বৃন্দগানের সুফল; দশম অধ্যায়—জীবিত ও ভূতপূর্ব গায়ক ও বাদকগণের পরিচয়।

প্রথম অধ্যায়

ফকীর উল্লাহ্‌ প্রথমে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা এবং মার্জিতরুচি প্রধান রাজপুরুষদের প্রতি সম্মান জানিয়ে তাঁর গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন। ১০৭৩ হিজরী সনে (১৬৬৩) একটি পুরাতন গ্রন্থ ফকীরের নজরে পড়ে। লেখকের সময় এই গ্রন্থটি মানকুতূহল নামে পরিচিত ছিল। এটি রচিত হয় গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা রাজা মান সিং-এর সময়ে। সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁর এত খ্যাতি যে সে সম্বন্ধে বলাই বাহুল্য। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ধ্রুপদ রচনা করেছিলেন। রাজা তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত গায়ক ছিলেন, যথা—নায়ক ভানু, নায়ক বখ্‌শু, নায়ক পান্দুয়ী (ইনি তিলঙ্গ দেশ থেকে পুণ্য ও স্নানের জন্য কুরুক্ষেত্রে এসেছিলেন)। মাহ্‌মুদ্‌, লোহঙ্গ্‌ এবং কিরণ। অধ্যাপককেই (মু'আল্লিম) নায়ক বলা হয়। উল্লিখিত গায়কগণ যখন মিলিত হলেন তখন রাজা ভাবলেন যে এই যুগ এবং কাল অতিক্রান্ত হলে এই শ্রেণীর নায়কদের একত্র হওয়া কঠিন হবে। সাধারণের হিতার্থে রাগসম্বন্ধীয় এই সব বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে শিক্ষার্থীদের অসুবিধা দূর হয়। এই কারণে রাগ, রাগিণী ও পুত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাগুলি লিপিবদ্ধ করা হল। রাজা নিজের নামে গ্রন্থ রচনা করলেন এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এই গ্রন্থকে আদর্শ অবলম্বন

করা যুক্তিযুক্ত মনে হওয়ায় ফকীর এই গ্রন্থের তর্জমা করলেন যাতে অনুসন্ধিৎসুগণের পক্ষে ভরতসঙ্গীত, সঙ্গীতদর্পণ ও সঙ্গীতরত্নাকর দেখবার প্রয়োজন না হয়। এই গ্রন্থে যাতে সময়ানুসারে সব বৃত্তান্ত পাওয়া যায় সেই প্রয়োজন মেটাবার জন্যই এটি রচনা করা হয়েছে। এই কারণেই এর নাম রাগদর্পণ—যেমন একটুকরো দর্পণে পর্বত ও মরুভূমির সবই প্রতিফলিত হয়। এতে রাগগায়নের সময় এবং সম্পূরণ প্রভৃতি তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কয়েকটি রাগ নৃত্যনির্ণয় অনুসারে লিপিবদ্ধ হয়েছে ও চন্দ্রাবতী তা লিখেছেন। অপর যে-সব রাগ এ অঞ্চলে নজরে পড়ে না সেগুলিও লিখিত হয়েছে। সুনিপুণ বাদকদের এমন সমাবেশের সুযোগও দেখা যায় না। রাজা নিজে বিশ্লেষণপূর্বক এটি রচনা করিয়েছেন। লেখকের এটি বোধগম্য হয়েছে এই বিশ্বাসেই ভগবানের ইচ্ছায় লেখায় হাত দেওয়া হল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানকুতূহল গ্রন্থে রাগসমূহ এই ভাবে লিখিত হয়েছে—

✓শুদ্ধরাগ : ভৈরোঁ—সম্পূর্ণ, প্রাতঃকালে গেয়।

মালকোশ, হিন্দোল—বসন্তকালে গেয়। সময়—প্রাতঃকাল ; বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রসে প্রযোজ্য।

দীপক—সম্পূর্ণ।

শ্রী—সম্পূর্ণ ; বীররস ; খরজগ্রাম ; সময়—সায়ংকাল।

মেঘ—খরজগ্রাম।

এই ছটি হচ্ছে আসল রাগ।

শ্রেণীবিভাগগুলি এই ভাবে দেখানো হয়েছে—

শুধ্, সংকীর্ (সংকীর্ণ), সালঙ্ক, সম্পূর্ণ, খাড়ো (খাড়ব) এবং ওড়ো (ঔড়ব)।

শুধ্—যে ছটি রাগ উল্লিখিত হয়েছে সেগুলি।

সংকীর্—যে সব রাগ রাগিণী ও পুত্র থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

সালঙ্ক—এগুলি ছাড়া যেগুলি বর্তমানে ও ইতঃপূর্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সুন্দর এবং অতুলনীয় ভাবে রচনা করেছেন। তাঁরা কয়েকটি রাগ একত্র করে একটি উত্তম রাগিণী রচনা করেন এবং এর নাম দিয়েছেন সালঙ্ক।

সম্পূরণ—সাতটি স্বর একত্র করে যে রাগ রচিত হয় তাকে সম্পূরণ বলে।

খাড়ো—ছটি স্বর সহযোগে প্রস্তুত।

ওড়ো—পাঁচটি স্বরে গঠিত।

এর চেয়ে কম স্বরের কোন ব্যবস্থা সম্ভব হয় না।

রাগিণী মানে স্ত্রীলোক (জন্) ও পুত্র মানে ছেলে (পুর্)।

প্রত্যেক রাগের পাঁচটি রাগিণী ও আটটি পুত্র আছে কিন্তু শ্রীরাগের ছটি রাগিণী ও নটি পুত্র।

দ্বিতীয়—সঙ্কীর্ণ পর্যায়।

ভৈরোঁ রাগের রাগিণীগুলির তালিকা দেওয়া হল। ওস্তাদগণ এই ভাবেই সিদ্ধান্ত করেছেন এবং শ্রীরাগ সম্বন্ধেও কিছু বলেছেন। প্রথমে ভৈরোঁ। বাঙ্গালী, ভৈরবী—সম্পূরণজাতীয় ; বেলাওলী। এগুলি শৃঙ্গার রসে ব্যবহৃত হয়।

পুত্র—বঙ্গাল (সম্পূর্ণ)। আনন্দজনক পরিবেশে গাওয়া হয়। সময়—প্রাতঃকাল।

পঞ্চম—বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুতরসে প্রযোজ্য। গ্রীষ্মে দিবসের প্রথম প্রহরে গেয়।

খরজগ্রাম।

মাধ্, হরখ্ (হর্ষ), বৈশাখী, ললত—সম্পূর্ণজাতীয়। প্রাতঃকালে গেয়।

বীররসে প্রযোজ্য।

বেলাওল—প্রাতঃকালে গেয়।

মাধুঞ্চ্।

ভৈরোঁর রাগিণী ও আটটি পুত্রের উল্লেখ করা হল। এখন মালকোশ-এর রাগিণী ও পুত্রাদির বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে—

গৌণ্ডক্রী, গান্ধারী, শহ্বরী (শর্বরী?) অন্ধিয়ালী, ও ধনাশ্রী।

পুত্র—মারোয়ী, নাদপ্রবল, মশ্তাঙ্গ্, চন্দ্রকোশ, ভুরস্টন ও খুখর।

হিন্দোলের রাগিণী ও পুত্রগণ—

রাগিণী—তিলঙ্গী, দেওগিরি। ওড়ব জাতি। দিবসের চতুর্থ প্রহরে গেয়। বাসন্তী। সিন্ধুরী, আভিরী।

পুত্র—মঙ্গল, চন্দ্রভান, সুভাঙ্গ, আনন্দ্, বিভাস। সম্পূর্ণ জাতি। প্রাতঃকালে গেয়। পরধন, বসন্ত—সম্পূর্ণ ; প্রভাতে গেয়।

দীপকের রাগিণী ও পুত্রগণ—

রাগিণী—কামোদিনী। খরজগ্রাম, সন্ধ্যাকালে সূর্যাস্তে গেয়। পটমঞ্জরী,

তোড়ী— সম্পূর্ণ জাতি। এটি শুনলে প্রাণে আনন্দ সঞ্চারিত হয়। গুর্জরী অথবা গুঞ্জরী—শৃঙ্গার রসে প্রযোজ্য। প্রভাতে গেয়। গান্ডলী।

পুত্র—গোল, কোসন্ত্ (কৌশম্বী ?) রাম, কণ্টল্ (কুন্তল ?), কুলঙ্গ, লহল্ চম্পক, হিমাল।

শ্রীরাগের রাগিণী ও পুত্রগণ—

রাগিণী—বীরারী। সম্পূর্ণ, রস-শৃঙ্গার।

কর্ণাটী, সাভরী, গৌরী—বীররস। দিবসের চার ঘড়িতে গাওয়া বিধেয়।

রামকরী, কেহ কেহ রামকলী বলেন। সম্পূর্ণ জাতি। সব সময়েই গাওয়া চলে।

সিন্ধবী—সম্পূর্ণ। সব রসেই প্রযুক্ত হয়।

পুত্র—সিন্ধু, মালু। সায়ংকালে গেয়।

গোন্দ্—সম্পূর্ণ; প্রাতঃকালে গেয়।

গম্ভীর, গুণসাগর, বিকট কল্যাণ; সম্পূর্ণ জাতি। সায়ংকালে গেয়।

কুম্ভ, আকট।

মেঘের রাগিণী ও পুত্রগণ—

রাগিণী—মল্লারী। প্রভাতে গেয়।

সুরঠী—সম্পূর্ণ জাতি। সায়ংকালে গেয়।

আসাওরী—সম্পূর্ণ জাতি। করুণরসে প্রযোজ্য। গায়ক বেঙ্কটমানী।

পুত্র—নটনারায়ণ। সম্পূর্ণ জাতি। বর্ষাকালে গেয়।

কান্হরা—সূর্যাস্তের পরে গেয়।

সারঙ্গ্—সম্পূর্ণ জাতি। দিবা দ্বিপ্রহরে গেয়।

কিদারা—সম্পূর্ণ জাতি। অর্ধরাত্রে গেয়।

গোন্দ্মল্লার, জালন্দাহ্, শঙ্করাভরণ—সম্পূর্ণ জাতি। প্রভাতে গেয়।

অতঃপর মিশ্ররাগের তালিকা দেওয়া হয়েছে। কোন্ কোন্ রাগ একত্র হলে নতুন রাগিণীর চেহারা ফুটে ওঠে সেটি দেখাবার জন্য লেখক কান্হরা (কানাড়া) থেকে আরম্ভ করেছেন। এই বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কান্হরার পাঁচটি প্রকারভেদ প্রদর্শন করেছেন।

শুধ্-কান্হরা—যখন কান্হরাকে ধনাশ্রীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। একে বাগেশ্রী বলা হয়।

আড়ানা—যখন কান্হরাকে মল্লারের সঙ্গে একত্রিত করা হয়।

শাহানা—যখন ফিরোদস্ত্কে কান্হরার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

পূরিয়া—যখন কান্হরাকে ধুলশ্রী ও মঙ্গলাষ্টকের সঙ্গে একত্রিত করা হয়।

খাড়ো কামোদের পাঁচটি প্রকারভেদ নির্দিষ্ট হয়েছে।

কামোদা—গোন্দ্ ও বেলাওল যখন একত্রিত হয়।

শুধ্ কামোদা—উক্ত কামোদাকে শুধ্-এর সঙ্গে একত্র করলে শুধ্ কামোদা হয়।

কল্যাণ কামোদ—যখন কামোদকে কল্যাণের সঙ্গে একত্র করা হয়।

সাওন্ত্ কামোদ—যখন সাওন্ত্কে (সামন্ত) কামোদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

তিলক কামোদ—কামোদকে খট্রাগের সঙ্গে একত্রিত করলে তিলক কামোদ হয়।

মালশ্রী—মালশ্রী, সরস্বতী, কেদারা, শঙ্করাভরণ। সম্পূর্ণ জাতি। সব সময় গওয়া চলে। মালশ্রী ও বিভিন্ন রাগ একত্রিত করলেও তাকে মালশ্রীই বলা হয়। কারণ কেবলমাত্র মালশ্রী শুদ্ধভাবে বর্তমান থাকলে তার নাম মালশ্রীই থাকে। (গ্রন্থের পাদটীকায় বলা হয়েছে যে ভরত তাঁর গ্রন্থে মালশ্রীর স্থানে মধ্মাধ্ এনেছেন।)

ধনাশ্রী—গৌরী, মারু ও জেতশ্রী।

জেতশ্রী—ধুল, বীরারী, দেশকার। সম্পূর্ণ জাতি।

ধুলশ্রী—যখন বীরারীকে জেতশ্রীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

রামকেলী—ভীমপলাশ, ললত ও রিওয়া।

গুণকলী—গোন্দ্, আড়ানা, গৌরী। সম্পূর্ণ জাতি। সায়ংকালে গেয়। একে গুণকরীও বলা হয়।

দেশকলী—দেশী, টোড়ী, ললত।

গোন্দ্কলী—গুজরী, আসাওরী। কথিত আছে গোরখ্নাথ এইটি প্রথমে গেয়েছিলেন।

খট্সার—টোড়ী, আসাওরী, শ্যাম, বহুল, গান্ধার ও বীরারী।

মঙ্গলাষ্টক—কেদারা, কল্যাণ, কান্হরা, চতুরশ্রী, শ্যাম।

চোরাষ্টা (চৌরাষ্টক ?)—আসাওরী, পূর্বী, ভৈরোঁ, দেওগান্ধার।

নটের নয়টি প্রকারভেদ এইভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে—

শুধ্-নট—বাগেশ্রী, পুরিয়া, মধ্মাত। সম্পূরণ। সন্ধ্যাকালে গেয়।

নটকল্যাণ—কল্যাণকে নটের সঙ্গে সংযোজন।

নট কান্হরা—কান্হরাকে নটের সঙ্গে সংযোজন।

নট কেদারা—কেদারাকে নটের সঙ্গে সংযোজন। সম্পূর্ণ জাতি।

হীর্ নট—যখন নটকে হীরের সঙ্গে একত্রিত করা হয়।

নটমল্লার—নটকে মল্লারের সঙ্গে সংযোজন।

কামোদনট—কামোদকে নটের সঙ্গে সংযোজন।

নটসারঙ্গ—নটকে সারঙ্গের সঙ্গে সংযোজন।

হমীরনট—নটকে হমীরের সঙ্গে সংযোজন। সম্পূর্ণ। প্রাতঃকালে গেয়।

নয়টি নট ব্যতীত আরও কয়েকটি দেখানো হয়েছে।

নটনারায়ণ—লঙ্ক্ দহন, মধ্ মাধবী, বীরারী, শঙ্করাভরণ। (পাদটীকায় বলা হয়েছে—রাগসাগর নামক গ্রন্থে এই রাগ এবং পঞ্চমকে ষড়রাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; মালকোশ ও মেঘকে বাদ দেওয়া হয়েছে।)

রাজনারায়ণ নট—গান্ভারীকে টোড়ীর সঙ্গে সংযোজন।

নাটকরম্ভা—ধূল, মধ্ মাত, ধনাশ্রী, কল্যাণ, কামোদ, কেদারা, আহীরী, কান্হরা—এই রাগগুলিকে নটের সঙ্গে একত্র করলে তাকে নাটকরম্ভা বলা হয়। এই রাগটি বলদেব গান করেছিলেন।

গ্রন্থপহাড়ী—শ্রীরাগ, মালুহ্ ও নট—এই তিনটির মিশ্রণে উৎপন্ন।

সরস্বতী—গৌরী, বিভাস ও করাহ্ (কোড়া?)—এই তিনটির মিশ্রণে উৎপন্ন।

পুরিয়া—গৌরী এবং মালুহ্ কে একত্র করে উৎপন্ন। সম্পূর্ণ। আনন্দজনক পরিস্থিতিতে গেয় (হঙ্গামে খুশ্ হালী বায়েদ্ সুরুদ্)। দিবসের চতুর্থ প্রহরে গাওয়া বিধেয়।

বড়হংস—জয়েৎ, পাহাড়ী, মারু যখন ধনাশ্রীর সঙ্গে যুক্ত হয় তখন এই রাগটি উৎপন্ন হয়।

ফিরোদস্ত্—পূরবী, গৌরী ও শ্যাম একত্র হলে তাকে ফিরোদস্ত্ বলে। এই রাগটি আমীর খুস্রও আলাইহে অল্ রহমৎ রচনা করেছিলেন।

মনোহর (গৌরী)—তর্উন্ (ত্রবণ), পাহাড়ী, মারু একত্রিত হলে এই রাগ উৎপন্ন হয়। একে গৌরীও বলা হয়।

মধ্ মাত—মল্লার ও মালশ্রীর মিশ্রণে উৎপন্ন। ঔড়ব রাগ। প্রাতঃকালে গেয়।

ত্রবণী—নটনারায়ণ, জেতশ্রী ও শঙ্করাভরণের মিশ্রণে উৎপন্ন।

শঙ্করাভরণ—বেলাওল ও কেদারার মিশ্রণে উৎপন্ন। এইটি মহাদেব গেয়েছিলেন।

লঙ্কদহন বা লঙ্কাদাহন (হনুনট)—জেত, পাহাড়ী ও কেদারার মিশ্রণে উৎপন্ন। একে হনুনট বলা হয়। পাদটীকায় বলা হয়েছে যে এর অপর নাম হনুনট।

পরবী—দেবগিরি, পূরবী, গৌরী ও গোন্দ্-এর মিশ্রণে উৎপন্ন।

খম্বাবতী[১]—মালশ্রী ও মল্লারের মিশ্রণে উৎপন্ন। এই রাগটি প্রথমে ভরত গান করেন।

অম্বাবতী—দেশী, আসাওরী, খট্‌রাগ-এর মিশ্রণে উৎপন্ন।

বীরারী—দেশকলী, টোড়ী ও ত্রবণী-র মিশ্রণে উৎপন্ন। সম্পূর্ণ। এই রাগটি প্রথমে তির্‌হুতে গাওয়া হত। এই স্থান থেকেই মারু, ধূল, ধনাশ্রী ও গান্ভারী—এই চারটি রাগ উৎপন্ন হয়েছে।

পটমঞ্জরী—উপরিউক্ত চারটি রাগ, অর্থাৎ মারু, ধূল, ধনাশ্রী ও গান্ভারীর সহযোগে উৎপন্ন।

কণ্ঠা—মারু, কেদারা, জেতশ্রী ও শুধ্-এর মিশ্রণে উৎপন্ন। পাদটীকায় বলা হয়েছে ভরতসঙ্গীত নামক গ্রন্থে এর নাম "খটশ্রী" লিখিত আছে।

টঙ্ক—ভৈরোঁ, কান্হরা, শ্রীরাগ, সারঙ্গ-এর মিশ্রণে উৎপন্ন।

নাগধন্ (নাগধ্বনি)—সুহর্ রাগকে মল্লার ও কেদারার সঙ্গে মিলিত করলে এই রাগ উৎপন্ন হয়। এর সম্বন্ধে লিখিত আছে যে এইটি নাগলোকে গাওয়া হয়।

পাদটীকায় বলা হয়েছে যে, কারো কারো মতে মাটির নিচে নাগের বসতি বর্তমান। অপর মতে মাটির উর্ধ্বেও নাগের বসতি আছে এবং এই প্রাণীরা রাক্ষস শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আভিরী—দেশকলী, কল্যাণ, গুজরী ও শ্যামের মিশ্রণে উৎপন্ন। সায়ংকালে গাওয়া বিধেয়। এই রাগটিকে প্রথমে কাহ্না বলা হত।

রবহংসমঙ্গল—শঙ্করাভরণ, সুরঠী ও আড়ানার মিশ্রণে উৎপন্ন।

সুরঠী—বঙ্গীয়াল, গুজরী, পঞ্চম, গান্ধার ও ভৈরবীর মিশ্রণে উৎপন্ন।

রাজহংস—শ্রীরাগ ও মালুহ্ এই দুটির মিশ্রণে উৎপন্ন। এই রাগটি ভরতের সম্মুখে নারদ গান করেছিলেন।

সীসমুধ্—টঙ্ক, শুধ্, গান্ধার, মালশ্রী ও ভীমপলাশীর মিশ্রণে উৎপন্ন।

সোহনী—ধূল ও গোন্দের মিশ্রণে উৎপন্ন।

---

১ আদর্শরূপে গৃহীত পুঁথিতে এটি "কভাবতী" লিখিত আছে। উইলার্ডের A Treatise on the Music of India-তে এটিকে খম্বাবতী বলা হয়েছে। এই পাঠটিই সমীচীন বোধ হয়।

দেশী—টোড়ী ও খট্‌রাগের মিশ্রণে উৎপন্ন। করুণরসে প্রযুক্ত হয়। সব সময় গাওয়া যেতে পারে।

দেওগিরি—সারঙ্গ, পূরবী ও শুধ্‌-এর মিশ্রণে উৎপন্ন। এই রাগটি দেবতারা গেয়েছিলেন।

কোলাহল—কল্যাণ, বিহাগড়া ও কান্‌হরা একত্র করে এই রাগ উৎপন্ন হয়েছে। এটিও ভরত গেয়েছিলেন।

শ্রীরওন—শঙ্করাভরণ, শ্রীরাগ ও মালশ্রীর মিশ্রণে উৎপন্ন।

ককৎ (?)—বিলাওল, পূরবী, কেদারা, দেওগিরি, মাধু এই রাগগুলির মিশ্রণে উৎপন্ন। শরৎ ঋতুতে গাওয়া হয়। করুণরসে প্রযোজ্য।

গুজরী—রামকেলী, শ্যাম, গান্ধার ও মঙ্গলের মিশ্রণে উৎপন্ন।

বিচিত্রা—চৈতী, গৌরী, শ্রীরওন, বীরারী এইগুলির মিশ্রণে উৎপন্ন।

কুলালী—নটনারায়ণ, কান্‌হরা, মল্লার এইগুলির মিশ্রণে উৎপন্ন।

হিন্দোল রাগ—ললত, লীলাবতী ভৈরোঁ, পঞ্চম, পুরিয়া এইগুলির মিশ্রণে উৎপন্ন। ভরত লিখেছেন যে, যাবতীয় রাগ, যেগুলিতে রাগিণী মিশ্রিত হয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটি এক এক করে মহাদেবের মুখ থেকে নির্গত হয়েছে। দীপক রাগ মহাদেবের পত্নী পার্বতী গেয়েছেন।

মেঘ—বসন্ত, সাওন্ত, কল্যাণ ও কামোদার মিশ্রণে উৎপন্ন।

বহুলা—রামকেলী, গুজরী, দেওকলী, বঙ্গীয়াল একত্র করে এই রাগ উৎপন্ন হয়েছে।

দেশাখ—শুধ্‌, শঙ্করাভরণ, কান্‌হরা ও মল্লারের মিশ্রণে উৎপন্ন।

শ্রীরাগ—গৌরী, টঙ্ক ও বড়হংসের মিশ্রণে উৎপন্ন।

বসন্ত—সারঙ্গ, নট মল্লার, বিলাওল ও দেওগিরির মিশ্রণে উৎপন্ন।

শঙ্করমন—লঙ্কাদাহন, সুরঠী ও বিলাবল একত্র করে এই রাগটি উৎপন্ন হয়েছে। এই রাগটি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, মহাদেব ব্যতীত অপর কেহই এটি জানতেন না।

বিলাওলী—বিলাওল ও সারঙ্গ এই দুটির মিশ্রণে উৎপন্ন।

কামোদিনী—সুহ্‌রায়ী (সম্ভবতঃ সুহ্রায়ী) ও সুরঠীর সহযোগে উৎপন্ন।

ইমন—কল্যাণ, কেদারা ও বিলাওলকে একত্র করে প্রস্তুত হয়েছে।

হমীর—কেদারা, কল্যাণ, ইমন এই তিনটির মিশ্রণে উৎপন্ন। এইটি প্রথমে গৌরীনাথ গেয়েছিলেন।

গান্ধার—সিন্ধু, ভৈরোঁ এবং আসাওরীর মিশ্রণে উৎপন্ন। সম্পূর্ণ।

দেওয়ারী—মালশ্রী, গন্ধারী ও সরস্বতীর মিশ্রণে উৎপন্ন।

গন্ধারী—ধনাশ্রী ও সুরটের মিশ্রণে উৎপন্ন। এই রাগ গণেশ রচনা করেছিলেন।

মধ্‌মিথুন—নটনারায়ণ, মল্লার, শুধ্‌, হমীর ও মধ্‌বন্‌ একত্রিত হয়ে এই রাগ উৎপন্ন হয়েছে। একে মাধবীও বলা হয়।

অগ্রম পঞ্চম—ললত, বিভাস, বসন্ত, দেশকার এইগুলির মিশ্রণে উৎপন্ন।

পঞ্চম—ললত ও বসন্তের সহযোগে উৎপন্ন।

গৌররাগ—নট, হমীর, হীর্‌ এইগুলির মিশ্রণে উৎপন্ন। মূল রূপটি গুজরাট থেকে এসেছে।

বেহাগরা—কেদারা, গৌরী, শ্যাম। সায়ংকালে গেয়।

নাটসারঙ্গ—দেওগিরি ও মল্লারের মিশ্রণে উৎপন্ন।

সারঙ্গ—দেওগিরি ও শুধ্‌-এর মিশ্রণে উৎপন্ন।

সুহা—বিলাওল ও বাগেশ্রীর মিশ্রণে উৎপন্ন।

শিবরতি—বড়হংস ও সিন্ধুর মিশ্রণে উৎপন্ন। এটি কামের পত্নী রতি প্রথমে গেয়েছিলেন।

সিন্ধবী—আসাওরী ও শিবরতির মিশ্রণে উৎপন্ন।

মরোয়া—ললত, দেশাখ, কান্‌হরা ও শ্রীরাগ যখন পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখন এই রাগ উৎপন্ন হয়।

কলাপ্রবীণ—কোকলৎ (?), কান্‌হরা, সুহা একত্রিত করে উৎপন্ন। এটি নারদ রচনা করেছিলেন।

ভূপালী—ইমন, গুণকলী ও কল্যাণ একত্রিত করে উৎপন্ন।

তোড়ী—ললত, ধনাশ্রী, ধূলশ্রী একত্রিত করে গঠিত।

ভৈরবী—শুধ্‌, শ্যাম, ভৈরোঁ একত্রিত করে উৎপন্ন।

দীপাবতী—দীপক ও সরস্বতীর মিশ্রণে উৎপন্ন। এটি রাজা বসন্ত[1] রচনা করেন।

আভীরবী—টঙ্ক, টোড়ী ও দেওগান্ধারের মিশ্রণে উৎপন্ন।

বঙ্গালী—বীরারী, গোন্দ্‌, গুজরী একত্রিত করে উৎপন্ন।

ললত—দেশী, বিভাস ও পঞ্চমের মিশ্রণে উৎপন্ন।

---

১ পুঁথিতে এই নামটি স্পষ্ট নয়। "বসম্প্‌"-এইরকম পাঠ পাওয়া যায়। সম্ভবত টিএ বসন্তই হবে।

মল্লার—নট, সারঙ্গ ও মেঘের মিশ্রণে উৎপন্ন।

সাওন্ত—নট, কেদারা, কান্‌হরা ও কামেদিনীর মিশ্রণে উৎপন্ন। সম্পূরণ। প্রাতঃকালে গেয়।

এই পর্যন্ত এই কিতাব থেকে তর্জমা করে দেখালুম। এইগুলি ছাড়া আরও কিছু সংখ্যক রাগিণী ও রাগ লেখকের নজরে পড়েছে যা গাওয়া হয়ে থাকে। এইগুলি রাগসাগর, রাগপ্রকাশ ও রিসালা-ই-সইদ্ মন্‌সুর—এই গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এছাড়াও রচনা করেছিলেন আমীর খুস্‌রও, শেখ্ বাহা-উদ্দীন্ জ্যাকেরিয়া মুলতানী ও সুলতান হুসেন্ শর্কী প্রভৃতি ওস্তাদবৃন্দ—এইরকম বর্ণিত হয়েছে।

আমীর খুস্‌রও সমস্ত রাগ থেকে বারোটি রাগ নির্বাচিত করে প্রদর্শন করেছিলেন। এইগুলির নাম এইভাবে দেওয়া হয়েছে—

বীরারীতে মালশ্রী, হুগাহ্ ও হুসায়নী একত্র করে মুয়াফ্‌ফেক্ নাম দেওয়া হয়েছে। একে দেওয়ালীও বলা হয়।

টোড়ীতে পঞ্চগাহ্ ও মুহাইয়ীর-এর গোশা একত্র করে মহীর্ নাম দেওয়া হয়েছে।

পূরবীকে ঘনম্ বলা হয়।

ফার্সী মোকাম থেকে শাহ্‌নাজকে খট্‌রাগের সঙ্গে মিশ্রিত করে জীলফ্ নাম দেওয়া হয়েছে।

ফার্সীতে খট্‌রাগকে "খজাল" বলা হয়। আরবীয় এবং আমাদের মার্গ ও দেশী সঙ্গীতে খট্ একটিই বর্তমান। এদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। খট্‌রাগ ভিন্ন ফার্সী ও হিন্দীতে সমান হয় এমন কোনও রাগ নেই। দেশী ও মার্গ পর্যায়ে কিছুসংখ্যক রাগ আছে যাদের মধ্যে তফাৎ নেই। মূল ছটি রাগ, অপর রাগের মধ্যে কল্যাণ, দেশকার, দেশাখ, গুজরী, গোন্দ্, সুরঠী, সিন্ধু, মধ্‌মাত, সাওন্ত, তর্‌ওয়ান্, বহুলা, জয়জয়ন্তী, মঙ্গল, ভৈরবী, বঙ্গাল—এই রাগসমূহের মধ্যে হয়ত কিঞ্চিৎ তারতম্য হতে পারে।

গৌরাকে ফর্‌ঘানা নাম দেওয়া হয়েছে।

ফরঘানার সঙ্গে ফার্সী মোকাম মিশ্রিত করে সারঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করে তার আখ্যা দেওয়া হয়েছে উশ্‌শাক্।

গোন্দ্-এ বিলাওল, গৌরসারঙ্গ ও ফার্সী মোকাম থেকে "রাস্ত্" সংযুক্ত করে সর্‌পর্দা নাম দেওয়া হয়েছে। কবি তাঁর স্বরচিত 'কিরান্-উস্-সাদায়িন' গ্রন্থে লিখেছেন—"গাহ্ তরান্নুম্ বুনুয়ায়ী কে খাস্ত্। জানিব্

সর্‌পর্দা শুদ্ আজ্ রাহ্ খাস্ত॥" অর্থাৎ তুমি যখন গান গাইতে চাইবে সরপর্দা হবে ঠিক রাস্তা।

উল্লিখিত রীতি অনুসারে আসল রাগের সঙ্গে অপর রাগের যোগ সাধন করে যেমন নতুন রাগ গঠন করা হয় সেই ভাবে কান্‌হরার সঙ্গে কয়েকটি রাগ একত্রিত করে ফিরোদস্ত্[১] নাম দেওয়া হয়েছে।

ইমন্-এর সঙ্গে নীরীজ্ যোগ করে তাকে ইম্‌নী আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

পূরবী, বিভাস, গৌরী, গুণকলী এইগুলিতে ফার্সী মোকামের অন্তর্ভুক্ত ইরাক মিশ্রিত করে সাজগীরী নাম দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে কিরান্-উস্-সাদায়িন্ গ্রন্থে তিনি নিজে বলেছেন—জম্‌জমা-ই-সাজগীরী দর্ ইরাক্। কর্দা বা আহঙ্গ্ ইরাক্ ইত্তিফাক্॥ অর্থাৎ ইরাকের মধ্যে রয়েছে সুর সাজগীরী। ইরাকের সঙ্গে অপর সুর মিলিয়ে এটি করা হয়েছে।

দেশকার-এর সঙ্গে ফার্সী মোকামের অন্তর্ভুক্ত বাখর্‌জ্ যোগ করে বাখর্‌জ্ নাম দেওয়া হয়েছে।

কল্যাণের সঙ্গে নীরীজ্ মিশ্রিত করে সনম্ আখ্যা প্রদান করা হয়েছে

এটি যেন গোপন না থাকে যে, সাজ্‌গীরি, বাখর্‌জ্, উশ্‌শাক্ ও মুয়াফ্‌ফেক্—এই চারিটির মধ্যে বড় রকমের কাজ করা হয়েছে যাতে এর মধ্যস্থ অন্য রাগগুলি রীতিসম্মত ও সুন্দরভবে একত্রিত করা যায়। অন্যান্য রাগগুলিতে মোকামের মিশ্রণ ছাড়া আর বিশেষ কিছু করা হয়নি এবং এক একটি আখ্যা প্রদান করা হয়েছে মাত্র।

আমীরের অন্য সমস্ত রাগ থেকে ইমন-বসন্ত পৃথক্ রচনা। এতে ইমন এবং বসন্ত এই দুটিকে একত্র করা হয়েছে।

সুলতান হুসেন শর্কী রাগসমুহ মিশ্রিত করে যে সকল নূতন রাগ রচনা করেন সেগুলির আঠারোটি নাম প্রদান করেন। যেমন নটের নয়টি প্রকারভেদ আছে, সেইরূপ বারোটি শ্যাম তিনি সংগঠিত করেন। সেগুলির নাম দেওয়া হয়েছে—

গৌরা-শ্যাম, শ্যাম-মল্লার, ভূপাল-শ্যাম, কান্‌হর্-শ্যাম, সুহ-শ্যাম, পুরবী-শ্যাম (সম্পূর্ণ), শ্যাম-রাম, মেঘ-শ্যাম, বসন্ত-শ্যাম, শ্যাম-বীরারী (সম্পূর্ণ), শ্যাম-কুড়ায়ী ও গোন্দ্-শ্যাম।

---

১ ইতঃপূর্বে ফিরোদস্ত্-এর যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে এই বর্ণনার মিল নেই। আগের বর্ণনা মানকুতুহল থেকে গৃহীত, এটি গ্রন্থকার সংগ্রহ করেছেন।

কুড়ায়ী[১] রাগটিকে 'সঙ্গীতবল্লভ' "সুভ্রায়ী" বলেছেন। পুরিয়া, শঙ্করাভরণ, কান্হরা এই তিনটিকে একত্রিত করে এই নাম দেওয়া হয়েছে।

শকী কর্তৃক চারিটি টোড়ী এইভাবে রচিত হয়েছে—

টোড়ীতে রামকলী ও মালশ্রী মিশ্রিত করে রামটোড়ী নাম দেওয়া হয়েছে। জৌনপুরী টোড়ীতে মালশ্রী ও মুয়াফ্‌ফেক্ মিশ্রিত হয়েছে। রস্থলী টোড়ীতে মুলতানী ও ধনাশ্রী মিশ্রিত হয়েছে।

ভীল্মী টোড়ীর পরিচয় লেখবার সময় মনে পড়ছে না। বর্তমান সঙ্গীতজ্ঞদের কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে লেখা যেতে পারে।

আসাওরীতে জৌনপুরী-টোড়ী যুক্ত করে জৌনপুরী-আসাওরী নাম দেওয়া হয়েছে। বসন্তরাগে জৌনপুরী-টোড়ী একত্র করে তার জৌনপুরী-বসন্ত আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

শেখ্ বাহাউদ্দীন জ্যাকেরিয়া মুলতানী, যিনি একজন সিদ্ধ আওলিয়া এবং শেখ সমূহের শেখ শহাবুদ্দীন ওমর্ সেহ্‌রওয়ার্দীর শিষ্য ছিলেন, তিনি এই নামগুলি প্রাচীন উল্লেখ থেকে উদ্ধার করে প্রদান করেন।

ধনাশ্রীতে মালশ্রী মিশ্রিত করে তাকে মুলতানী-ধনাশ্রী বলা হয়।

নায়ক বখ্‌শু তিনটি রাগ রচনা করেন।

টোড়ীতে দেশকার যুক্ত করে বহাদুরী নাম দেওয়া হয়েছে। সুলতান বাহাদুর গুজরাটির নাম অনুসারে এই নামকরণ করা হয়। অপর একটি কান্হরা তিনি রচনা করেন যাতে শ্যাম ও খম্বাইচী যোগ করা হয়। আর একটি কল্যাণ তিনি রচনা করেন যাতে হমীর, কল্যাণ ও জয়েৎকল্যাণ যোগ করা হয়। এই কল্যাণ ও কান্হরাকে নায়কীকল্যাণ ও (নায়কী) কান্হরা বলা হয়। লোকান্তরিত মিয়াঁ তানসেন মল্লারে কান্হরা যোগ করেন এবং কান্হরায় কল্যাণ যোগ করেন। তিনি আসাওরীতে দেবগান্ধার যুক্ত করেন। উক্ত কান্হরাকে দরবারী-কান্হরা নাম দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে তিনি যখন সম্রাট আকবরের কাছে তাঁর রচনা প্রদর্শন করেন তখন এই নাম দেওয়া হয়। আর একটি রাগের নাম দেওয়া হয়েছিল পুরিয়া-ধনাশ্রী। ওস্তাদগণের মধ্যে কোন নায়ক এটি রচনা করেছিলেন তা জানা নেই, তবে নায়ক বখ্‌শু, মিয়াঁ তানসেন ও মালোয়ার শাসনকর্তা বাজবাহাদুর—এঁরা ছিলেন গীতকলায় অদ্বিতীয়। ওস্তাদগোষ্ঠীর সকলেই এই রাগে

১ গ্রন্থের পাদটীকায় বলা হয়েছে, "কুড়ায়ী, অর্থাৎ আনন্দসূচক" (কুড়ায়ী ইয়ানে খুশ-হালী আমদ)। আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায় আকবর এই রাগের নাম দেন সুভ্রায়ী।

পারদর্শী ছিলেন। ধনাশ্রীর সঙ্গে সমানভাবে পুরিয়া মিশ্রিত করে এই নাম রাখা হয়েছে।

চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ জ্ঞাত আছেন যে, প্রত্যেক রাগে অপর একটি রাগ যোগ করলে আসল রাগটি গাইবার সময় প্রথমে আসবে। এটি এইভাবে বোঝানো যায়। যেমন, শ্যাম-রাম। এক্ষেত্রে শ্যাম প্রথমে আসবে। একটি রাগের সঙ্গে অপর একটি রাগ মিশ্রিত হলে সেটিও প্রথমে আসে। যেমন, পুরিয়া-ধনাশ্রী। এক্ষেত্রে পুরিয়া প্রথমে এবং ধনাশ্রী পরে আসে। সবক্ষেত্রেই যে এটি হবে এমন নয়। ব্যতিক্রম হতে পারে যদি কেউ উত্তমভাবে রাগ বা রচনা প্রস্তুত করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, টোড়ীর ক্ষেত্রে এরূপ ঘটেছে। অপর একটি রাগের সঙ্গে টোড়ী গাইবার সময় অপরটি আগে আসবে এবং তার পরে টোড়ী আসবে। ওস্তাদগণ এইরূপ সিদ্ধান্তই করেছেন যে একে টোড়ী বলা হবে। কয়েক প্রকার টোড়ী আছে যেগুলি কলির পূর্বভাগে গাওয়া হয়। অপরগুলি গানের শেষ অংশে প্রযুক্ত হয়। সব ভাষাতেই বর্ণগুলি এমনভাবে আসা উচিত যাতে পদের শেষ মিলটি যথাযথ হয়। এইটিই নিয়মসম্মত প্রথা।

একপ্রকার ললত-পঞ্চম আছে যাতে পঞ্চমের সঙ্গে ললত যোগ করে এই নামটি রাখা হয়েছে।

আর একটি রাগ হচ্ছে পরজ। মারুতে ধনাশ্রী যোগ করে এটি রচিত হয়েছে। এটি প্রায়ই গাওয়া হয়ে থাকে।

অপর রাগ হচ্ছে আড়ান-আসাওরী। আসাওরীতে আড়ানা মিশ্রিত করে এটি রচিত হয়েছে।

অন্য একটি রাগ হচ্ছে জয়েৎ-কল্যাণ। কল্যাণে জয়েৎশ্রী যোগ করে এটি রচিত হয়েছে।

এই ধরনের আরও বহু রাগ আছে। যেমন, গৌর-সারঙ্গ ; খমাইচী ; (এইখানে একটি টোড়ীর উল্লেখ আছে সেটি স্পষ্ট পড়া গেল না) ; মুলতানী-টোড়ী ; মাঝ ; জয়তী ; গৌরী ; ছায়ানট—দিবাশেষে গেয় ; রুঝরী-জয়জয়ন্তী—সায়ংকালে গেয় ; ইমন-কল্যাণ ; ইমন-বিলাওল ; ইমন-কেদারা ; ইমন-সারঙ্গ ; ক্ষেম-কল্যাণ ; পুরিয়া ; মুখারী—এটি খাড়ব ; মৌন-ধ্যান ; ঘারা-শ্যাম—সম্পূর্ণ, সন্ধ্যায় গেয় ; বাঢ়ী—সায়ংকালে গেয় ; গৌর—দিবার অপরার্ধে গেয় ; আভীরী—ওড়ব, সায়ংকালে গেয় ; সালঙ্গ্-নাট—সূর্যাস্তের পর গেয় ; তুর্ক-তোড়ী—ফার্সী মোকামসমূহ থেকে "ইরাক" দাখিল করে

এই রাগটি রচিত হয়েছে : হোসেনী টোড়ী—এতে দুগাহ্ ও হোসেনী একত্রিত হয়েছে ; সাওনী-লীলাবতী—এটি খাড়ব রাগ ; মানিয়াহী কল্যাণ—পাদটীকায় বলা হয়েছে একে "সাওনী"ও বলা হয়। এটি গোয়ালিয়রের রাজা মান রচনা করেন। দেশকার, গৌরী ও বিভাসকে একত্রিত করে তরওয়ন (ত্রবণ) রচনা করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ; সায়ংকালে গেয়।

জয়েতী খম্বাবতী, জয়েৎশ্রী, আহীরী, টঙ্ক, বীরারী—এইগুলিকে একত্র করে কাপুর-গৌরী রচিত হয়েছে। এটি গুজরাট অঞ্চলে গাওয়া হয়।

মালীগৌরা, ধনাশ্রী, পুরিয়া, বহুলা, পাঢ়ী, আসাওরী—এইগুলি একত্র করে মালীগৌরা রচিত হয়েছে।

টোড়ী, করঞ্জ, সালঙ্গ্‌নট, দ্রবড় (দরাওর), গৌরবথাল—এইগুলিকে একত্র করে দেশকার বলা হয়। এটি সম্পূর্ণ। দিবসের দ্বিপ্রহরে গেয়। শীত ঋতুতে গাওয়া হয়।

হিন্দোল, বসন্ত, জয়জয়ন্তী, পঞ্চম, খট্‌রাগ, মারু, সারঙ্গ ও সাওনী—এইগুলি একত্র করে গাইলে মালকোশ উৎপন্ন হয়।

ফকীর (লেখক) নিজেও কিছু রাগ রচনা করেছেন। জয়েৎশ্রীতে হিন্দোল, কেদারা মিশ্রিত করে তার নাম রেখেছি জয়েৎ-বসন্ত্। জয়েৎশ্রী, কল্যাণ, পুরিয়া-ধনাশ্রী, বসন্ত—এইগুলিকে একত্র করে নাম দিয়েছি রাবী-সিন্ধবী। কুড়ায়ী, গৌর-সারঙ্গ, বিহাগড়া, সুহ, বিলাওল, দেওগিরি, নট—এইগুলি একত্র করে নাম রেখেছি সুন্দরাবতী। আড়ানা ও কেদারা একত্র করে তার নাম দিয়েছি আড়ানা-কেদারা।

কিন্তু এই বিষয়টি জানা উচিত যে, যদি কেউ কয়েকটি রাগ একত্র করে একটি রাগ বাঁধতে চান তা হলে রাগসমূহ সেইভাবে একত্রিত করে প্রদর্শন করা উচিত হবে যেমন করে কেউ কয়েকটি বিভিন্ন তার যথাযথভাবে বেঁধে নিয়ে সেগুলি থেকে একটি খাঁটি সুর উৎপন্ন করেন। কেবলমাত্র রাগগুলি একসঙ্গে এলেই তার থেকে এমন কোনও রাগ উৎপন্ন হবে না যার একটি নির্দিষ্ট নাম দেওয়া যায়। এইগুলিকে (অর্থাৎ এইভাবে পর পর কয়েকটি রাগ গেয়ে যাওয়াকে) "রাগসাগর" বলা হয়। ওস্তাদগণ এই রীতি প্রস্তুত করেছেন ও গেয়েও থাকেন। মহরাঞ্জলামী[১]-তে এটি দেখানো হয়েছে। পাঠকগণের কাছে এটি যেন গোপন না থাকে যে, আমি মানকুতূহল, রাগসাগর ও রাগপ্রকাশ থেকে বিষয়সমূহ স্পষ্টভাবে অনুবাদ করেছি। এই প্রসঙ্গে যে

১ এই নামটি স্পষ্টভাবে বোঝা গেল না।

বিষয়সমূহে আলোকপাত করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি সে ফাঁক পূরণ করেছি স্বনামধন্য ব্যক্তিদের স্মৃতি থেকে সংগ্রহ করে। এই বিষয়টি গাণিতিক। বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এটি স্পষ্টভাবে জ্ঞাত আছেন যে সঙ্গীতবিদ্যা অতিশয় কঠিন বিদ্যাসমূহের অন্যতম। পুর্-ই-শীনা[২] জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন এবং সে-সব বিষয়ে কত আলাপ আলোচনাই না করতেন। কিন্তু সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনায় যখন তিনি গণিতে এসে পৌঁছোতেন তখন তাঁকে স্বীকার করতে হত যে গণিতের একটি বড় অংশ হচ্ছে সঙ্গীত। সঙ্গীতজ্ঞকে বিষয়টি বোঝাবার জন্য মস্তিষ্ক সঞ্চালন করতে হয়, স্মৃতির উত্তম আলোড়ন ঘটে। বিভ্রান্ত ব্যক্তির কী শক্তি আছে যে নিজের উপর নির্ভর করে এ সম্বন্ধে কিছু লেখেন। এটি অবশ্যই সত্য যে আমিও সব জিনিস জানি না। মিসৃরা—এই জ্ঞান হল যে সব বিষয়ে আমার জ্ঞান হয়নি (দানেস্তা শুদ্ কে হিচ্ নদানেস্তায়েম্ মা)।

তৃতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ে মৌসুম (ঋতু) সমূহের বর্ণনা ; ঋতু অনুসারে গ্রাম, রাগ, রাগিণী ও পুত্রাদির প্রয়োগ ; নিষিদ্ধ হরফের উল্লেখ ; গণ-সম্বন্ধীয় তথ্য ; ঋতুসমূহে প্রযুক্ত গ্রামগুলি গাইবার কালনির্দেশ—এইগুলি বিবৃত হয়েছে। পাঠক বা শিক্ষার্থীদের কাছে এটি যেন অগোচর না থাকে যে প্রাচীন সঙ্গীত দেবতাদের দ্বারা নির্দিষ্ট, কেন না এঁরাই এই বিদ্যার আবিষ্কর্তা।

একটি বৎসরকে ছয়টি ঋতুতে বিভক্ত করা হয়েছে। এক এক ঋতুতে দুটি করে মাস। এই ঋতুগুলিতে গাইবার জন্য ছয়টি রাগও নির্দিষ্ট হয়েছে। প্রত্যেক ঋতুতে একটি রাগ, রাগিণী ও পুত্রাদি সমেত গাওয়া হয়। সময় অনুসারে গ্রাম নির্দিষ্ট করা হয় ; পরে দেবতা ও মধ্যে নায়কগণের স্থান নির্দেশ করা হয়। পঞ্চু বা গোপাল সবরকম গান এইভাবেই গাইতেন। তৎকালে প্রত্যেক সময়ের নির্দেশ অনুযায়ী যেসব গান গাওয়া হত শ্রোতাদের উপর তাদের একটা প্রভাব পড়ত। বর্তমানে এই সমস্ত বিধি উঠে গেছে ; এই কারণে সেই সব প্রভাবও অল্পই অনুভূত হয়। এখনও যদি শিক্ষার্থীরা এই বিধি অনুসরণ করেন তা হলে তাঁরা বুঝতে পারবেন এই নীতি কতখানি

২ আবু আলী বীন্ শীনা, Avicenna নামে পরিচিত।

প্রভাব বিস্তারে সমর্থ। যদি কোনও ভক্তজনের (আহ্‌লুল্লাহ্‌) কাছে গান করা যায় তা হলে ভাল মন্দ যাই হোক না কেন তার একটা প্রভাব তাঁদের উপরে পড়বেই। যখন তাঁরা খুশী হন তখন তার পরিমাপ করা যায় না। এই কারণেই বলা হয়েছে, মসনবী—ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাঁদের উপর আছে—তাঁরা ডোঙার (যা দিয়ে ক্ষেতে জল দেওয়া হয়) আওয়াজেই মস্ত্‌ হয়ে যান। তাঁরাও ডোঙার মত নাচতে থাকেন। সেই সময় বুঝতে পারা যায় সঙ্গীতের প্রভাব ভাল কি মন্দ। মন তখন খুশী হয়ে ওঠে। বিশেষ বিবেচনা করেই এই রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রথমে মৌসুম এবং প্রত্যেক মৌসুমে প্রযুক্ত রাগের কথা বলা হচ্ছে।

বসন্ত ঋতু—চৈত্র ও বৈশাখ—এই দুই মাস।
গ্রীষ্ম ঋতু—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—এই দুই মাস।
বর্ষা ঋতু—শ্রাবণ ও ভাদ্র—এই দুই মাস।
শরৎ ঋতু—আশ্বিন ও কার্তিক—এই দুই মাস।
হেমন্ত ঋতু—অগ্রহায়ণ ও পৌষ—এই দুই মাস।
শীত ঋতু—মাঘ ও ফাল্গুন—এই দুই মাস।

এখন দেবতাগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট রাগ, রাগিণী ও পুত্রাদি যে সব ঋতুতে গাওয়া হয় সে বিষয়ে বলা হচ্ছে।

প্রথমে বহার বা বসন্ত ঋতু নির্দিষ্ট হয়েছে। বসন্তকালে রাগ হিন্দোল রাগিণী ও পুত্রাদি সহ গাওয়া হবে। গ্রীষ্ম ঋতুতে রাগ দীপক, বর্ষায় মেঘরাগ, শরৎ কালে শ্রীরাগ, হেমন্তকালে রাগ মালকোশ ও শীতকালে ভৈরোঁ গাওয়া বিধেয়।

গ্রামসমূহের কাল নির্ধারণ

হেমন্তকালে খরজ গ্রামে গাওয়া হয়। গ্রীষ্মে মধ্যম গ্রাম ও বর্ষায় গান্ধার গ্রাম প্রযুক্ত হয়।

সকালে খরজ গ্রাম, দ্বিপ্রহরে মধ্যম ও সন্ধ্যায় গান্ধার গ্রাম নির্দিষ্ট হয়েছে। অপর তিনটি ঋতুতেও গ্রামসমূহের নির্দেশ করা হয়েছে।

ধ্রুপদ প্রভৃতি গীতে নিম্নলিখিত আটটি হরফ নিষিদ্ধ হয়েছে। এইগুলির প্রয়োগ অশুভজনক—

হ, জ, খ, ন, ধ, র, ঘ, ভ।

এতদ্ব্যতীত চারটি গণও নিষিদ্ধ করা হয়েছে; যথা, জ-গণ, র-গণ, স-গণ ও ত-গণ[১]। এইগুলি নায়কগণ পরিজ্ঞাত আছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বরসমূহ ও নিবদ্ধ গীত সম্বন্ধীয় তথ্যাদি এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু।

সাতটি স্বরের সাতটি নাম দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক গ্রামের স্বরগুলি এক একটি জানোয়ারের আওয়াজ থেকে গৃহীত। এগুলির উৎপত্তি ও বিস্তার এবং কণ্ঠ থেকে কিভাবে এগুলি নির্গত হয়—এই সমস্ত এই অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়। নিম্নজঠর থেকে গলা, মস্তিষ্ক পর্যন্ত বাইশটি রগ আছে। নাভিদেশ থেকে মনোহর গতিতে বায়ুপ্রবাহ উত্থিত হয় এবং বিস্তারগত প্রকৃতির আধিক্য ও মন্থরতা অনুসারে এই আওয়াজ উত্থিত হয়। পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম ও দশম থেকে ক্রমান্বয়ে দ্বাবিংশতম—এই রগগুলিতে বায়ুপ্রবাহ পৌঁছায়[২] এবং এই আঠারোটিতে যে আওয়াজ জাগ্রত হয় তাকে সাত ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। সেটি এইভাবে নির্ণয় করা হয়েছে।

ষড়জ—ময়ূরের আওয়াজ থেকে গৃহীত। চতুর্থ রগ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। বায়ু-প্রবাহ নাড়ি থেকে গলদেশ ও বক্ষে, বক্ষ থেকে মুখগহ্বরে এবং সেখান থেকে জিহ্বায় ও দন্তে পৌঁছায়। খরজ এই ছটি স্থানে পরিব্যাপ্ত।

রেখাব—পাপিয়ার আওয়াজ থেকে গৃহীত। সপ্তম থেকে দশম পর্যন্ত পৌঁছায়। বায়ুপ্রবাহ নাভি থেকে গলদেশ এবং গলদেশ থেকে মস্তিষ্কে পৌঁছায়।

গান্ধার—পুং ছাগের আওয়াজ থেকে গৃহীত। নবম থেকে ত্রয়োদশতম পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। বায়ুপ্রবাহ নাভিদেশ থেকে গলদেশ, সেখান থেকে বক্ষদেশ এবং উক্ত স্থান থেকে মুখে পৌঁছায়।

---

১ এ সম্বন্ধে পুঁথি স্পষ্ট নয়। সঙ্গীত দামোদর-এর উক্তি থেকে জানা যায়—জ, র, স, ত—এই চারটি গণ বিপরীত ফলপ্রদ। "গণ" শব্দে গুরু ও লঘু হিসাবে তিনটি বর্ণের সমাবেশ বোঝায়। সঙ্গীতরত্নাকরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। পুঁথির পাদটীকায় এই দোঁহাটি উদ্ধৃত হয়েছে—

হ জ ধ র খ ন ঘ ভ আদি গীত গাওত নিসান।
অশুভ হয়ী পিঙ্গল কহি আরি কুনি মন জান॥

২ এই উক্তি ভ্রান্ত বলে মনে হয়। আইন-ই-আকবরীর বর্ণনায় বলা হয়েছে—পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ—এই চারটি রাগে বায়ুপ্রবাহ পৌঁছায় না। এইটিই সঙ্গত নতুবা বাকি আঠারোটি রগের কথা উঠতে পারে না।

মধ্যম—সারসের শব্দ থেকে এটি পরিচিত হয়েছে। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শতম রগ পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। বায়ুপ্রবাহ নাভি থেকে বক্ষে পৌঁছায়।

পঞ্চম—কোয়েলের সুরেলা কণ্ঠ থেকে গৃহীত। সপ্তদশতম রগ অধিকার করে আছে। বায়ুপ্রবাহ নাভি থেকে বক্ষের উপর পার্শ্বদেশে এবং সেখান থেকে মস্তিষ্কে এবং উক্ত স্থান থেকে বক্ষদেশে পরিভ্রমণ করে।

ধৈবত—ভেকের আওয়াজ থেকে গৃহীত। অষ্টম (অষ্টাদশ হওয়া উচিত) থেকে দ্বাবিংশতম রগ পর্যন্ত বিস্তৃত। বায়ুপ্রবাহ নাভি থেকে মুখের টাকরায় এবং সেখান থেকে গলদেশ, উক্ত স্থান থেকে মস্তিষ্কে, মস্তিষ্ক থেকে বক্ষদেশে পরিভ্রমণ করে।

নিষাদ—হাতির আওয়াজ থেকে গৃহীত। দ্বাবিংশতম থেকে পরবর্তী মণ্ডলীর তৃতীয় পর্যন্ত বিস্তৃত। বায়ুপ্রবাহ নাভি থেকে গলদেশ, গলদেশ থেকে মুখের টাকরা এবং সেখান থেকে মস্তিষ্কে পৌঁছায়।

এই সপ্তস্বর পর পর তিনটি পর্যায় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। অবশ্য এই তিন সপ্তকের অবস্থিতির মধ্যে নিখাদ বাইশটির বেশী অতিক্রম করবে না।

গীতসম্বন্ধীয় বিবরণ

ফার্সী শের (কবিতা)-এর যেমন বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে—যথা, মসনবী, কসিদা, ঘজল, রুবায়ী, মুখাম্মস্, মুসজ্জা, কিতা, মুস্তজাদ—হিন্দী ভাষাতেও এইরকম বহু রচনা আছে। কিন্তু এগুলি গীতের অন্তর্গত (শের বা কবিতা নয়) এবং গায়কগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। এইগুলির সংখ্যানির্ণয় করা হচ্ছে—

গীত—তিন প্রকার। দেবতা ও বাদশাদের প্রশংসা হচ্ছে এর বিষয়বস্তু।

সূর্যপ্রকাশ ও চন্দ্রপ্রকাশ—এই দুই প্রকার গীত একই রকম। একটি সূর্যের ও অপরটি চন্দ্রের স্তবসূচক। প্রথমটি অর্থাৎ সূর্যপ্রকাশের দ্বাদশটি কলা (খণ্ড)। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ চন্দ্রপ্রকাশের সর্বসমেত ষোলটি কলা। খণ্ড অনুসারে তাল ও রাগ আবর্তিত হয়।

সর্বতোভদ্র—এতে চারটি ক্রম অনুযায়ী তাল আবর্তিত হয়।

রাগকদম—কয়েকটি কলিতে নিবদ্ধ। কয়েকটি স্থানে রাগ ও তাল যুক্ত হয়। এতে নায়িকার সজ্জা বা যুদ্ধ সম্বন্ধীয় রচনা পাওয়া যায়। বর্তমানে এটি মার্গপদ্ধতির অন্যতম। এটি দেবতাগণ রচনা করেছিলেন। এখন সেই সব রীতি লুপ্ত হয়ে গেছে। এই স্থানে উক্ত সঙ্গীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কমই আছেন এবং এই শ্রেণীর গীত প্রচলিত নেই বললেই চলে। দক্ষিণ দেশে এর

প্রচলন থাকতে পারে, কেন না সেখানে দেশীপদ্ধতিতে রাগসঙ্গীতের প্রচলন একেবারেই ছিল না। যা কিছু রাগ সেখানে গাওয়া হত সব মার্গপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবতঃ ওইদিকে এইগুলি এখনও প্রচলিত আছে। কিন্তু যে সমস্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ফকীরের (লেখক) কাছে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁদের কথায় জানা যায় যে, ওইদিকেও মার্গসঙ্গীতে অভিজ্ঞ গায়ক আর নেই। এমন ব্যক্তিও অল্পই আছেন যাঁরা সবরকম রাগের বা দেশী গীতের অনুষ্ঠান করতে সক্ষম।

ঝোমরা—চারিটি কলিতে নিবদ্ধ। দেবতাদের স্তুতিসূচক গীত। (বাকি অংশ ছিন্ন হওয়াতে স্পষ্ট বোঝা গেল না)।

স্বরবর্তনী—(প্রথম অংশ ছিন্ন)। এর মধ্যে এমন শব্দ থাকে যার কোন অর্থ নেই।

প্রবন্ধ—দুটি কলিতে নিবদ্ধ। দেবতাগণের প্রশংসাসূচক গীত (কিছু অংশ ছিন্ন)। ধ্রুপদের অস্তিত্ব এতে ছিল কিন্তু এই থেকেই ধ্রুপদ আসেনি (বর্ ইন্ বুদ্ তা ধুর্পদ্ ব্-ওজুদ্ নি-আমদা বুদ্)।

মন্—এতে আত্মপ্রশংসা ও সামান্য পরিমাণে অপর বিষয় গাওয়া হয়। এটি দেশী পর্যায়ের গীত।

ধ্রুপদ—প্রধানতঃ এই গীতকে গঠন করেন গোয়ালিয়রের রাজা মান, যাঁর কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এটি চারটি কলিতে নিবদ্ধ। (পাদটীকায় এই চারটি কলি উদ্ধৃত হয়েছে—উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুয়া ও আভোগ)। সম্মেলনে আগত নায়ক বখ্‌শু, নায়ক ভান্নু, মাহ্‌মুদ, কিরণ ও লোহঙ্গ—এঁদের সাহায্যে এই গীতটি রচনা করা হয়। এই ধরনের রচনা অভিজ্ঞ এবং সাধারণ সকলেরই পছন্দ হয়েছিল এবং উত্তম বলে পরিগণিত হয়েছিল। এ অঞ্চলে এর মত উত্তম রচনা আর নেই। এর প্রমাণস্বরূপ আমার দুটি বক্তব্য আছে। প্রথম শ্রেণীর ধ্রুপদের রাগ ও গীত মার্গপদ্ধতিকে অবলম্বন করে রচিত। অপরটিতে রাগসঙ্গীত অল্পতর হলেও রচনার সংগঠনে শৈথিল্য ঘটেনি। এই জাতীয় সঙ্গীত লোকে দেশীয় বা দেশওয়ালী ভাষায় গেয়ে থাকে। এ কথাও আগেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ধ্রুপদে গায়নবৈশিষ্ট্য গায়ক নিজেই প্রদান করেন। এই কারণে উক্ত সম্মেলনে যে গীত সংগঠিত হয়েছে সেটি দেশী ও মার্গ উভয়ের মিশ্রণে প্রস্তুত। সবকিছু থেকে সামান্য সামান্য গ্রহণ করে এই বিস্ময়কর গীত সৃষ্টি হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, রাজার নিজের আমলের গায়কসম্মেলন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রায়

দুশো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে ; তথাপি সেই প্রতিষ্ঠার গৌরব অক্ষুণ্ন রয়েছে। পরবর্তীকালে যদি উক্ত রাজার মত আর এক জন জন্মগ্রহণ করতেন এবং তাঁর মত ক্ষমতাসম্পন্ন হতেন তা হলে তাঁর সময়েও ধ্রুপদের মত সঙ্গীত সৃষ্ট হতে পারত। সেই ক্ষমতা, মহত্ত্ব ও প্রসারতার অস্তিত্ব অসম্ভব নয় কিন্তু মনে হয় যে সেরকম বুঝি আর হবে না। এ কথা বলছি কেন না মার্গীয় রাগসঙ্গীত, দেশীভাষায় সম্পাদিত মার্গসঙ্গীত এবং দেশী পদ্ধতিকে একত্র করে যে উত্তম নাদের (সঙ্গীতের) সৃষ্টি হয়েছে বর্তমানে কেউ যদি তদনুযায়ী কোনও নূতন রচনা করেন তা হলেও তা সব কিছুই রাজার নির্দেশে প্রস্তুত ধ্রুপদকেই অনুসরণ করে থাকে। দেশী ভাষায় অনুষ্ঠিত ধ্রুপদ সময়ানুসারে বা স্থানানুসারে খরোড়া[1] ভাষায় গাওয়া হয়। মার্গীয় রীতিতে অনুষ্ঠিত ধ্রুপদ সংস্কৃত ভাষায় গাওয়া হয়। দেশীয় প্রথায় অনুষ্ঠিত ধ্রুপদ গোয়ালিয়র থেকে আকবরাবাদ্[2] ও বারী অঞ্চলে প্রসারিত। উত্তরে মথুরা পর্যন্ত এর সীমা। পূর্বে এটাওয়া, দক্ষিণে উনছ্ এবং পশ্চিমে ভুসাও ও বয়ানা পর্যন্ত এর সীমা নির্দিষ্ট। এই শহরগুলিতে হিন্দুস্থানের ভাষাসমূহ বহুল পরিমাণে শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে বলা হয়। পারস্যের উদাহরণ দিতে গেলে এই শহরগুলিকে শিরাজের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

দক্ষিণাঞ্চলে দ্রাবিড়ী ভাষায় রচিত গীতসমূহকে "ছন্দ্" নাম দেওয়া হয়েছে। এর তিনটি প্রকারভেদ বর্তমান। চারটি চরণ একত্রিত করে এটি নিবদ্ধ অথবা তার বেশীও হতে পারে। এটি প্রশংসাজ্ঞাপক গীত। তিলঙ্গী ও কর্ণাটকের ভাষায় রচিত গীতকে "ধরু" বলা হয়। এগুলি প্রেমসঙ্গীত। বাঙ্গালায় প্রচলিত গানকে "বঙ্গলা" বলে। এটিও প্রেমসঙ্গীত। জৌনপুরে প্রচলিত গীতকে "চুট্‌কলা" বলা হয়। এতে দুটি কলি থাকে। পদান্তে মিল থাকে না ও তালে গাওয়া হয় না। দুটি কলির দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ কবিতার মত বিন্যস্ত। প্রথম কলিতে যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। এটি প্রেম ও বিরহ বিষয়ে রচিত এইরূপ লিখিত আছে। এই গীত যুদ্ধ সম্পর্কেও রচিত হয় এবং উক্ত গীতকে "সাধর্-চুট্‌কলা" বলা হয়। এই গীতের স্রষ্টা হচ্ছেন সুলতান হুসেন শর্কী। ইনি জৌনপুরের বাদশা ছিলেন। ইনি দিল্লীর বাদশা

১ এই শব্দে খড়ী-বোলী অর্থাৎ সৎ উর্দু বোঝায়। এতে জানা যাচ্ছে যে সৎ উর্দু ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হত।

২ আগ্রা।

বাহ্‌লুল লোদীর সঙ্গে অনর্থক বহু যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে রাজ্য ও সর্বস্ব হারান। পুরাতন ইতিহাসসমূহে (পাস্তানী নামাহা) এইরকম লিখিত আছে।

দিল্লীতে প্রচলিত গীত—কওল, তরানা, খিয়াল, নক্‌শ্, নিগার, বসিৎ, তিলাল্লানা, সোহ্‌লা। এইগুলি মীর্ খুস্‌রও কর্তৃক প্রবর্তিত। তাঁর সামুৎ ও ততার নামে দুই বন্ধু ছিলেন। ফার্সী সউৎ ও নক্‌শ্ এবং হিন্দী সঙ্গীতের মিশ্রণে এই গীতগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কওল—এটি গীত-এর সমতুল্য।

নায়ক গোপাল সুলতান আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে দিল্লীতে আসেন। মীর্ গীত-এর প্রতিপক্ষ হিসাবে কওল রচনা করেন। এই সম্বন্ধীয় বৃত্তান্তটি এইভাবে প্রচলিত আছে—

নায়ক গোপাল স্নানের জন্য থানেশ্বরের অন্তর্গত কুরুক্ষেত্রে আসেন। এই কূপটি থানেশ্বরের অন্তর্ভুক্ত। সম্রাট আকবর এর চারদিকে ইঁট ও লোহার প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন। (এইখানে কুরু ও পাণ্ডবের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে—অংশটি ছিন্ন)। হিন্দুদের (হুনূদ্) বিশ্বাস, এইখানে ভীমসেন বহু হাতীকে হাওয়ায় নিক্ষেপ করেছিলেন। আজ থেকে চার হাজার বৎসর পূর্বে এই যুদ্ধ হয়েছিল। কয়েক কোটি লোক এই যুদ্ধে হত হয়। একশত লক্ষে এক কোটি হয় এবং একশত হাজারে এক লাখ। এত লোকের মোট সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। এই স্থানে প্রতিদিন তীর্থ উপলক্ষ্যে লোকজন আসে। বৎসরে একবার স্নান করে লোকে পাপ ক্ষালনপূর্বক পুণ্য অর্জন করে। এইরকম একশতের অধিক স্থান আছে।

বয়েৎ—শরীরকে ধুয়ে কি ফল যদি পবিত্র শরীর নিয়েই আসতে!

(শুস্‌তনে কালেব্ আগর কালেব্ জিদা আম্‌দী।)

তা হলে জলের প্রাণীরাই তো শুদ্ধতায় এগিয়ে থাকত। এই উক্তিটি বিখ্যাত—

মিস্‌রা—এক আহাম্মক বললে আর এক গর্দভ বিশ্বাস করলে।

(আহ্‌মকে গুফ্‌ৎ ও খরে বাওর্ করদ্।)

বর্তমানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আজকালকার লোকেদের মধ্যে এটা দেখছেন যে যা কিছু ব্রাহ্মণরা বলে তারা তাই বিশ্বাস করে। কিছুমাত্র বুদ্ধি খাটায় না। যদি তারা বুদ্ধি খাটাত তা হলে ঈশ্বরের উপাসনা ছেড়ে পুতুল পূজা করত না (আগর আক্‌লী মী দাশ্‌তন্দ্, খুদাপরস্তীরা গুজাশ্‌তা বুৎপরস্তী নমীকর্‌দন্দ)।

নায়ক স্থানের উদ্দেশ্যে এলেন। এই সময় আলাউদ্দিন খল্‌জী সুলতান ছিলেন। সুলতান জালালউদ্দিন খল্‌জী ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। পবিত্র রমজান মাসে রোজা উপলক্ষ্যে উপবাসী (রোজাদার) সুলতান পবিত্র কুরান পাঠ করে ফিরবার সময় নিহত হন। পুরাতন ইতিহাসসমূহে এই কথাই বলা হয়েছে। তিনি শহীদ্ হবার পর আলাউদ্দিন নিজে রাজত্বের ভার গ্রহণ করেন। পূর্বসূত্রে অধিষ্ঠিত গায়ক মীর খুস্‌রও নাচার হয়েই তাঁর অধীনে রয়ে গেলেন। তাঁর জ্ঞান ছিল সমুদ্রের এক তীর থেকে অপর তীরের মত বিস্তৃত। তিনি একটি "ডাণ্ডী" ব্যবহার করতেন। এটি ছিল কাঠের তৈরি—এক হাত দুই আঙুল লম্বা। কেহ কেহ বলেন এটি এক ওয়াজব্ (৯ ইঞ্চি) ও দু আঙুল লম্বা। এর আওয়াজ থেকে তিনি ভাল করে সুরগুলি পেতেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যন্ত্রে সুর রাখা। এই যন্ত্রটি একমাত্র তাঁরই ছিল কেন না পারস্যে (ভিলায়াৎ) দম্‌ঘজ্‌ঘা[1] ব্যবহৃত হত। জলাজল্ (ঘণ্টা) ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা হত। অপর কেউ বাঁধলে তার সঙ্গে লড়াই হত—দুজনে পরস্পরের প্রতি ধাবিত হতেন। যুদ্ধের গায়কেরাও থাকতেন। যুদ্ধেও সঙ্গীত ব্যবহৃত হয়। ভগবানের ইচ্ছায় এই সঙ্গীতের দরুন যুদ্ধে আহত ব্যক্তির প্রাণে কষ্ট কম হয় এবং আবার লড়াইয়ের ক্ষমতা আসে। এই সঙ্গীতের জন্যই মরণাপন্ন ব্যক্তি প্রাণ ফিরে পায়[2]।

যখন খবর পৌঁছালো যে গোপাল লড়াইয়ের মতলবে আসছেন তখন মীর সুলতান আলাউদ্দিনকে বললেন—"বর্তমানে গোপালের সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। তাঁর সঙ্গে বারোশ'রও বেশী শিষ্য রয়েছেন। কাহারের পরিবর্তে তারাই তার সিংহাসন বহন করে আনছে।" অতঃপর খুস্‌রওকে একটি চারপায়ার তলায় লুকিয়ে রেখে সুলতান গোপালকে আহ্বান করে বললেন—"খুস্‌রও অসুস্থ। সুস্থ হলে তিনি আসবেন। সেই সময় পর্যন্ত আপনি সঙ্গীত পরিবেশন করুন।" গোপাল এসে গান করলেন। যখনই গোপাল আসতেন খুস্‌রও আগে থেকেই এসে মঞ্চের তলায় লুকিয়ে থাকতেন। এইভাবে ক্রমাগত ছটি প্রভাত অতিক্রান্ত হবার পর সপ্তম মজলিসে মীর শিষ্যসমভিব্যাহারে সামুৎ ও ততারকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন। গোপাল

১ পাদটীকায় হাকিম্ সুজানের একটি উক্তি দেওয়া হয়েছে;—এখন তথ্‌তার চেয়ে সরলতর লাউ ব্যবহৃত হবে। দম্‌ঘজ্‌ঘার তথ্‌তার স্থানে পিছনদিকে লাউ থাকবে।

২ এই অংশটি খুব স্পষ্টভাবে লিখিত হয়নি। কিছুটা আন্দাজ করে অনুবাদ করা গেল।

পরিশ্রম করে গাইলেন এবং মীরকে গাইতে অনুরোধ করলেন। মীর বললেন—"আমি মুঘল[1], দেশ থেকে সবে এসেছি। আমার দিলকে খুশী করবার জন্য হিন্দুস্তানের কিছু গান আমি স্মৃতিতে রক্ষা করেছি। আপনাদের মত আমার বাদ্যযন্ত্র নেই। আমি ডাণ্ডী বেঁধে নিচ্ছি। আপনি আগে গান করুন, তার পরে আমার যা আসে তাই গাইব।" গোপাল শুরু করলেন। তিনি একটি হরগীত, একটি মন্ ও স্বরবর্তনী গাইলেন। মীর বললেন—"এই সব গান আমি আগেই বেঁধেছি।" গোপাল বললেন—"গেয়ে দেখান।" মীর হরগীতের উত্তরে কওল্ ও বসিৎ গাইলেন। গোপাল বিস্ময়ের সমুদ্রে গিয়ে পড়লেন এবং বিশেষ বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। অতঃপর মীর বললেন—"এগুলি যা গাইলাম তা এখানকার গুণীদের সহবাসে লব্ধ; কিন্তু যা কিছু আমি নিজে সৃষ্টি করেছি সে সমস্ত এখন আপনাদের শোনাব।" তাঁর নিজস্ব রচনার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তিনি সেগুলি গাইলেন। গোপাল ও সমস্ত মজলিস এই সুরবৈচিত্র্য এবং বাক্যের যাদুতে খুশী হয়ে উঠলেন। উক্ত মজলিসে অমাত্যাদি থেকে সাধারণ সকলেই মুক্তকণ্ঠে বললেন যে তাঁর উপর প্রচুর ভগবৎ-কৃপা বর্তমান, কেন না তিনি একটি শুনেই সব শুনে ফেলেছেন এবং স্মৃতি থেকে একই গানগুলির প্রত্যুত্তরে কওল প্রভৃতি রচনা করেছেন। (এইখানে একটি বয়েৎ উদ্ধৃত করা হয়েছে কিন্তু ছিন্ন বলে ভাল পড়া গেল না)।

খিয়াল্—দুটি কলিতে গঠিত। দেশী ভাষায় গাওয়া হয়। বর্তমানে এটি দিল্লী অঞ্চলে প্রচলিত। আকবরের সময়ে এটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। যখন আকবরাবাদ রাজধানী হল সেই সময় যাবতীয় গায়ক ও ওস্তাদ যাঁদের তুলনা কোনও যুগে দেখা যায় নি তাঁরা ওই স্থানে জমা হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই গোয়ালিয়রের বাসিন্দা ছিলেন। এখন এটা হচ্ছে ১০৭৬ হিজরী। এর আগে শাহ্‌জাহানের সময় দিল্লীর কাছে শাহ্‌জাহানাবাদ ছিল রাজধানী। এর একদিকের বিশ্ববিখ্যাত সুন্দর ইমারৎগুলি সুলতান ফিরোজ শাহের তৈরি। এইগুলি দক্ষিণে দিল্লীর সঙ্গে মিশে গেছে।

(এর পর শাহ্‌জাহানাবাদের প্রশংসা ও দীর্ঘ শের আছে। অপ্রাসঙ্গিক বোধে এই অংশের তর্জমা করা হল না।)

বর্তমানে যে সব ভাষা ভালভাবে বলা হয় তা দশ শতেরও অধিক।

১ খুস্‌রও মুঘল ছিলেন না। তাঁর পিতা ছিলেন তুর্কী কিন্তু তাঁর জন্ম ভারতে, তাঁর মাও ভারতীয় ছিলেন।

এইসব ভাষায় প্রেম ও প্রেমিক সম্বন্ধীয় গান রচিত হয়েছে। কতকগুলি খিয়াল্ আছে যেগুলি চারটি কলি সহযোগে গঠিত। কিন্তু প্রথম দুটি কলির পদান্তে মিল শেষের দুটি কলির মিল থেকে ভিন্ন।

নক্শ্—এতে গদ্যাংশ থাকে। উপরের অর্থাৎ প্রথম ভাগে তা, না, তলী—এইগুলি উচ্চারিত হয়। "মন্" নামক গীতের পদ্ধতিতে এটি রচিত।

নিগার—স্বরবর্তনীর পাল্টা রচনা।

বসিৎ—ছন্দ্-এর পাল্টা রচনা।

তরানা—ইচ্ছামত কবিতা ও গদ্য হতে পারে কিন্তু এতে তা, না, তলী—এইসব শব্দ থাকবে।

তিলন্নানা—সম্পূর্ণ তা, না, তলী—এই শব্দাদি দ্বারা গঠিত।

ফার্সী—এতে কিছু বয়েৎ থাকবে। ইচ্ছা হলে কসীদা সহ ঘজল্ তাল সহযোগে গাওয়া যেতে পারে।

ফরদ্—এতে একটি বয়েৎ রাগ ও তাল সহযোগে গাওয়া হয়।

সোহ্লা—কয়েকটি কলিকে একত্র নিবদ্ধ করে রচিত হয়। কোন ব্যক্তির প্রশংসায় বা কোনও উৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

বিষণপদ—এটি চার থেকে আট পংক্তিতে নিবদ্ধ। এতে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করা হয়।

ত্রিবট (তরওয়ট্)—দুই থেকে চারটি কলিতে নিবদ্ধ। এর সঙ্গে পাখোয়াজ বাদিত হয়।

কাবী—সিন্ধু দেশের গান। এতে প্রেমের প্রাচুর্য থাকে।

লচারী—তিরহুতের ভাষায় গাওয়া হয়। প্রেমঘটিত মনান্তর এর বিষয়বস্তু।

গুজ্রী—গুজ্রাটে গাওয়া হয়। এটি প্রশংসাজ্ঞাপক গীত।

কড়্খা—যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়। এটি চার থেকে আটটি কলিতে নিবদ্ধ। এর দুটি দুটি কলি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে গাওয়া হয়।

সাধ্রা—চার, ছয় বা আটটি কলিতে নিবদ্ধ। বিভিন্ন ভাষায় গাওয়া হয়। যুদ্ধবিষয়ক গীত।

বাললীলা—উৎসবাদিতে অনুষ্ঠিত হয়। এটি খিয়ালের মত দুটি কলিতে নিবদ্ধ। সন্তানের জন্মোৎসবে পিতামাতার চোখের সামনে আলোকোজ্জ্বল অনুষ্ঠানে দোলনায় দোল দিতে দিতে এই গান গাওয়া হয়।

উৎসব উপলক্ষ্যে ওস্তাদগণ মঙ্গলাষ্টক, জয়েৎশ্রী প্রভৃতি রাগ গেয়ে থাকেন।

ছন্দ্—লাহোরে প্রচলিত। কয়েকটি কলিতে নিবদ্ধ। সেখ্ বহাউদ্দিন জ্যাকেরিয়া মুলতানী একে ফার্সীতে "চন্দ্" বলে অভিহিত করেছেন। এতে সঙ্গীতের সঙ্গে কবিতা যুক্ত হয়। এটি প্রেমসঙ্গীত।

ডপা (টপ্পা)—পাঞ্জাবেই বেশীরভাগ গাওয়া হয়। ওই দেশের ভাষাতেই এটি রচিত হয়। দুই থেকে চারটি কলিতে নিবদ্ধ। এর বেশীও হতে পারে। তবে দুটি দুটি কলির পদান্ত ভিন্ন ভিন্ন মিলযুক্ত হয়। এটি প্রেমসঙ্গীত। মৃত্যুকামনা বা আত্মোৎসর্গও (প্রেমের জন্য) এর বিষয়বস্তু হয়ে থাকে।

মাঙ্গল—সব ভাষাতেই গাওয়া হয়। জৌনপুরে অধিক প্রচলিত। কয়েকটি কলি বর্তমান। এর কলিগুলিও ভিন্নভাবে মিলযুক্ত হয়। দুটি কলি গাইবার পর আবার প্রধান কলিটি আবৃত্তি করা হয়ে থাকে। এর পর তালটি সম্পূর্ণ হয়। এর বিষয়বস্তু—প্রেম, প্রেমিক ও বিরহ।

বার্—এটি ঢাঢ়ী ব্যতীত অপর সম্প্রদায় গান করেন। এতে কবিতার কয়েকটি কলি থাকে। এতে যুদ্ধবিষয়ক আখ্যায়িকা সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়। কমপক্ষে দুজনে এই গীত গেয়ে থাকেন। প্রথমে ওস্তাদ দুটি কলি গান করেন। তারপর শিষ্য তৃতীয় কলিটি গান। অতঃপর ওস্তাদ আবার দুটি দুটি কলি গান করেন ও তাঁর সঙ্গী প্রত্যেক অংশের পরে প্রথম কলিটি আবৃত্তি করেন।

জকৃরী—এই গীত সম্পর্কে কিছু বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই, তবে কয়েকটি কলিতে এটি গঠিত। ইচ্ছানুসারে এটি নিয়মিত হয়। দুটি কলির ভিন্ন ভিন্ন মিল হয়ে থাকে। প্রত্যেক কলির শেষে তাল সম্পূর্ণ হয়। এর রচয়িতা কাজী মাহ্মুদ্ গুজ্রাতিয়ৎ। তাঁর গ্রন্থে প্রেম, প্রেমিক, মৃত্যুস্মরণ প্রভৃতি বিষয়ক গীত লিখিত আছে।

এইসব লিখিত গীত ব্যতীত চতুর্দিকে বহু গীত প্রচলিত আছে। বর্তমানে যে সব গীত প্রচলিত সেগুলি উদ্ধার করে দেখানো হল।

পঞ্চম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে বাদ্য, নায়ক ও সখী সম্বন্ধীয় বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে।

বাদ্য চার প্রকার

তত—যেগুলি তার সহযোগে বাজানো হয়।

বিতত—যেগুলি চর্মের উপর বাজানো হয়।

ঘন—যেগুলি ধাতুসহযোগে বাজানো হয়।

সুখর্ (সুষির)—যেগুলি ফুৎকার প্রয়োগে বাজানো হয়।

বহু প্রকার বাদ্য আছে। এর মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হল।

প্রথমে যন্তর্—কাষ্ঠনির্মিত। লম্বায় এক গজ। ভিতরটা ফাঁপা। দুদিকে দুটি লাউ থাকে। লাউ দুটির উপরের দিকের এক অংশ কেটে বেঁধে দেওয়া হয়। দণ্ডের উপর ষোলটি পর্দা সংযুক্ত থাকে এবং তার উপর দিয়ে পাঁচটি লোহার তার দুই প্রান্ত থেকে দৃঢ়ভাবে বাঁধা থাকে।

বীণ—যন্তরের মত কিন্তু এতে তিনটি তার বর্তমান।

কিন্নরবীণ—বীণের মত, কিন্তু দণ্ডটি ঈষৎ বেশী লম্বা এবং তিনটি লাউ ও দুটি তার থাকে।

সুরবীণ—বীণার মত কিন্তু এতে পর্দা থাকে না।

অম্বরতী (অমৃতী ?)—এর দণ্ডটি সুরবীণের দণ্ড অপেক্ষা ছোট। একটি ক্ষুদ্র লাউ উপরের দিকে একটু নিম্নভাবে সংলগ্ন থাকে। একটি লোহার তারে অপরিবর্তিতভাবে সব কটি পর্দা বাজানো যায়।

রবাব—এতে ছটি তাঁতের তার থাকে। কোন কোন যন্ত্রে বারোটি এবং কোনটিতে আঠারোটি থাকে। যাতে বেশী তার থাকে তাতে তামার তার লাগানো হয়। এর দুটি প্রয়োজনীয়তা আছে। এক হচ্ছে যাতে এর দরুন বর্ষাকালের হাওয়ায় তাঁতের তারগুলি ঢিলে হয়ে যাবার ফলে বৈলক্ষণ্য না ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, এর দরুন চুটকলা এবং খিয়ালের সঙ্গে সঙ্গত যথাযথভাবে হতে পারে এবং বাদ্যের কোমলত্ব বজায় থাকে। রবাবী তার বেশী লাগানো যাতে আওয়াজ করুণ[১] হয়। কিন্তু ওস্তাদ যদি পটু হন তা হলে ষট্‌তন্ত্রী রবাবেও যথাযথ সঙ্গত করতে সক্ষম হন; এর আসল কারণ রবাব নয়, বাদকের কৌশলটাই হল প্রধান।

বয়েৎ—বাজাবার কৌশল যে পর্যন্ত না মোলায়েম হবে সে পর্যন্ত কানে মোম গলতে থাকবে। (তা মোলায়েম নওয়াজীশ্ ফন্ শুদ্। গোশ্ হায়ে তরফ্ মোম্ রওঘন্ শুদ্।)

স্বরমণ্ডল—কানুনের মত যন্ত্র। পঁচিশটি তার থাকে। কেউ তামার তার ব্যবহার করেন, কেউ লোহার তার। অর্ধেক তার শেষের দিকে থাকে আর অর্ধেক কানুনের মত। কানুনে চল্লিশটি তার থাকে। তিনটি একদিকে

১ এখানে "হজীন্" শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। "হজীন" অর্থ করুণ; কিন্তু এক্ষেত্রে করুণ মানে মোলায়েম অথচ গম্ভীর আওয়াজ বুঝতে হবে।

চারটি অপরদিকে আলাদা আলাদা বসানো। অপর তারগুলি এক জায়গায় দুটি করে বাঁধা থাকে। এর তারগুলি সবই ভিন্নভাবে থাকে।

সারঙ্গী—ঘিচকের মত বাজানো হয়। রবাবের চেয়ে ছোট।

পিনাকচুবী—কাষ্ঠনির্মিত। ধনুকের মত ঈষৎ বক্র। তাঁতের তার বাঁধা হয়। কাষ্ঠনির্মিত পেয়ালার মত একটি বস্তু এই বাদ্যের দুদিকে উল্টোভাবে বসানো থাকে। কেহ কেহ এর বদলে লাউ-এর অর্ধাংশও যোজনা করে থাকেন। এই যন্ত্রটিও ঘিচকের মত বাজানো হয় কিন্তু বাঁ হাতে একটি ছোট লাউ রাখা হয়। এটি বাজাবার কাজে লাগে।

ধিউটী—এতে একটি লাউ ও দুটি তার থাকে।

কিঙ্গীরা—বীণের মত। এতে দুটি তাঁতের তার থাকে। এর লাউগুলি তম্বুরার লাউ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। এইগুলিকে তাজী (আরবী) তম্বুর বলা হয়। উক্ত বাদ্যে লোহার ও তামার পাঁচটি তার থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই যন্ত্র ইচ্ছানুসারে চামড়া দিয়ে বাঁধা হয়; অপর ক্ষেত্রে চামড়া লাগানো হয় না। যখন চামড়া দিয়ে বাঁধা হয় তখন বীণের মত রাগ অনুযায়ী বাজাবার জন্য কম বেশী করা হয়। যেগুলিতে চামড়া দেওয়া হয় না সেগুলিতে অমৃতীর মত অপরিবর্তিতভাবে বাজানো হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়—বিতত।

পাখাওয়াজ—নৃত্যরত মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে। ফার্সী ভাষায় এই বাদ্যকে "তরঙ্গ্" বলা হয়। তবে পাখাওয়াজ এর চেয়ে বড়। মোটা কাঠ থেকে হরিতকীর মত আকৃতিতে তৈরি করা হয়। এর মাঝখানটা ফাঁপা থাকে। লম্বায় একগজের কিছু বেশী হয়। যদি এর মধ্যভাগ বগলের ভিতর দিয়ে ধরা যায় তা হলে দুহাতের আঙুল একত্র মিলবে। এর মুখদুটি কলসীর মুখের চেয়ে কিছু চওড়া হয়। এদের চামড়া দিয়ে ছাওয়া হয়। এর চারদিকে নাকাড়ার মত চামড়ার পাত টানা থাকে। চারটি কাঠের টুকরো এক হাতের কিছু কম দূরে বাঁদিকে পাখাওয়াজের বৃত্তে লাগানো থাকে। এই কাঠের টুকরোগুলিকে মুচড়ে সুর নামানো চড়ানো হয়।

আওয়াজ—এটি ফাঁপা কাঠ থেকে তৈরি। দুটি ছোট তবল পিছন দিক থেকে জোড়া দিলে যেরকম হয় সেরকম। দুটি মুখ চামড়ায় ছাওয়া হয় এবং দৃঢ়ভাবে বদ্ধ থাকে।

ঢুহুল—এটি সুপরিচিত (অর্থাৎ ঢোল)।

দফ্—এটিও বিশেষ পরিচিত।

ঢুহলকী—ঢুহুলের অর্ধেক।

ঢঢা—ঢুহুলের মত কিন্তু প্রান্ত দুটি ঢুহুলের চেয়ে ছোট।

অর্ধাওয়াজ—আওয়াজের অর্ধেক।

খনজরী—দফের ক্ষুদ্র সংস্করণ। ভিতরে রণনাত্মক ঘণ্টি থাকে।

তৃতীয় পর্যায়ের বাদ্য।

সিনুজ—একে হিন্দীভাষায় তাল বলা হয়। মুখ দুটি সমান করে গঠন করা হয়। দেখতে বিস্তৃত ওষ্ঠযুক্ত পেয়ালার মত।

কাঠতাল—ছোট মাছের মত আকৃতি। চারটি করে থাকে। কাঠের বা পাথরের তৈরি।

জলতরঙ্গ—চিনেমাটির চার ধরনের পেয়ালা (পিয়ালহায়ী চিনী) ব্যবহৃত হয়। একটি থেকে আর একটি ক্ষুদ্রতর। এগুলিতে জল রাখা হয়। রাগ অনুসারে এই জলের পরিমাণ কম ও বেশী করা হয়। দুটি কাষ্ঠদণ্ড হাত দিয়ে ধরে নাকাড়ার মত বাজানো হয়। পারস্যে এই বাজনা আছে কিন্তু এর নাম নেই। এই বাজনাকে "চিনী-নাওয়াজ" বলা হয়। কবিতাতেও এইরকম উল্লেখ পাওয়া যায়। বয়েৎ—

একদিকে চিনীনাওয়াজগণ চতুর কৌশলী; পাত্রে মদ না থাকলেও মজলিসকে তারা মাতাল করে তুলল।

(দর্ ভিলায়েৎ ইন্ সাজ্ হস্ত্ আমা নাম্ ন-দরদ্ ও সাজন্দ্ হায়ে ইন্‌রা চিনী-নাওয়াজ্ গুয়েন্দ্। চুনাঞ্চে দর্ শের্ হম্ বস্তা আন্দ্।)

বয়েৎ—এক্ তরফ্ চিনী নওয়াজান্ সবক্‌দস্ত্ আজ্ ফুসুন্; করদা মজ্‌লিস্‌রা জ্ সাঘর্‌হায়ে বে-মাই সর্-গিরান্।)

চতুর্থ পর্যায়ের বাদ্য।

শাহ্‌না—ফার্সীতে একে সুর্ণা বলে।

মশ্‌ক্—এতে দুটি ছোট বাঁশি থাকে এবং তাতে মাপ অনুযায়ী কয়েকটি ছিদ্র থাকে। এই বাঁশি দুটি মশ্‌ক্ অর্থাৎ চামড়ার থলিতে মিলিত হয়। ফার্সী ভাষায় একে "নাই-অম্বান্" বলে।

মুরলী—একে "তাজী-নাই" বলা হয়। লম্বায় বংশী-শ্রেণীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট।

উপাঙ্গ্—একপ্রকার বাঁশি। ভিতরটা ফাঁপা। লম্বায় এক গজ। এর উপরের দিকে মধ্যস্থানে একটা ফুটো থাকে এবং এই ফুটোর ভিতরে একটি সরু বাঁশি বসানো থাকে।

নায়ক-বর্ণনা :

অনুকূল—যে এক স্ত্রী ভিন্ন অপরের সঙ্গে বিহার করে না।

দক্ষিণ—অনেক মহিলাতে যার সমান আসক্তি থাকে।

ধৃষ্ট—যে স্ত্রীলোক কর্তৃক তিরস্কৃত হলেও লজ্জিত হয় না এবং দোষ দেখিয়ে দিলেও মিথ্যা কথা বলে।

শঠ—যে স্ত্রীলোকের প্রতি কপট আচরণ করে।

নায়িকা তিন প্রকার :

স্বকীয়া—গৃহকর্মে নিপুণা ; বন্ধুতাযুক্তা ; সত্যতা থেকে ভ্রষ্ট হয় না ; চক্ষু চতুর্দিকে ঘূর্ণিত হয় না ; ছিদ্রান্বেষণ করে না ; হাসে কিন্তু দন্ত উন্মিলিত করে না ; স্বামী আসবার সাড়া পেলে আপনা থেকে ত্বরান্বিত হয়ে বহির্গত হয় ; বাক্যে ক্রোধ প্রকাশ করে না।

পরকীয়া—নৈপুণ্যের সঙ্গে গোপনে অপরের সঙ্গে প্রণয় করে।

সামান্যা—কারুর অধিকৃত নয় ; বাঁধা থাকে ; বেশ্যা।

স্বকীয়া তিন প্রকার :

মুগ্ধা—যৌবনসীমান্তে উপস্থিত।

মুগ্ধা তিন রকম :

অজ্ঞাতযৌবনা—যার মধ্যে বালিকাভাব ও যৌবন মিশ্রিত হয়ে আছে ; গলার আওয়াজ বাঁশির মত ; নিজের সম্বন্ধে উদাসীন।

জ্ঞাতযৌবনা—যৌবনপ্রাপ্তা।

বিশ্রব্ধনূঢ়া—স্বামী বর্তমানেও স্বামীর কাছ থেকে পলায়নপরা।

মধ্যানায়িকা—যার লজ্জা ও স্বামী সম্ভোগের ইচ্ছা সমান।

প্রগল্‌ভা নায়িকা—স্বামীর প্রতি গভীর আসক্তিসম্পন্না এবং অতিরিক্ত কামপরায়ণা।

মধ্যানায়িকা তিন প্রকার—

ধীরা—যে অন্যসহবাসরক্ত স্বামীকে উপহাস করে।

অধীরা—যে অন্যসহবাসরক্ত স্বামীকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে।

ধীরাধীরা—যে অন্যসহবাসরক্ত স্বামীর প্রতি অভিমানযুক্ত হয়ে ক্রন্দন-সহযোগে তিরস্কার করে।

স্বকীয়া নায়িকা দুই প্রকার :

জ্যেষ্ঠা—যার প্রতি স্বামী অপর রমণী অপেক্ষা অনুরক্ত।

কনিষ্ঠা—যার প্রতি স্বামীর আসক্তি কম।

পরকীয়া নায়িকা দুই প্রকার—পরোঢ়া ও কন্যকা।

পরোঢ়া—যে অন্যের প্রতি আসক্ত হয়েও ভয়ে স্বামীকে পরিত্যাগ করতে পারে না।

কন্যকা—অবিবাহিতা। মাতাপিতার অজ্ঞাতে পুরুষের প্রতি প্রণয়ে বদ্ধ হয় ও কার্যসিদ্ধি করে।

পরোঢ়া ছয় প্রকার :

গুপ্তা, বিদগ্ধা, লক্ষিতা, কুলটা, অনুশয়ানা, মোদিতা।

গুপ্তা—যে গুপ্তভাবে পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়।

বিদগ্ধা—এটি দুই প্রকার ; বাক্‌বিদগ্ধা ও ক্রিয়াবিদগ্ধা।

বাক্‌বিদগ্ধা—সাহসী, বাক্‌পটু, মনোরঞ্জনে সক্ষম (কর্‌দারে শগরুফ্), ক্ষমতাসম্পন্না।

ক্রিয়াবিদগ্ধা—কার্যে অতিশয় তৎপর এবং পরপুরুষের সহিত প্রণয়-কারিণী।

লহতা (লক্ষিতা)—প্রিয়ের সঙ্গে মিলনে যে গোপনতাকেও ভয় করে না।

কুলটা—যথেচ্ছ সহবাসকারিণী।

অনুশয়ানা—উদ্যান, মাঠ, গাছ প্রভৃতি স্থানে রাত্রে গোপনে প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হয়। শীত বা বর্ষায় সেই সব স্থানে যেতে পারে না কেন না গোপনতা রক্ষা করা যায় না। তখন ওইসব স্থান দেখে কাতর হয়ে পড়ে ও চিন্তান্বিত হয়।

মোদিতা—বাসগৃহ থেকে স্বামী প্রভৃতি বহির্গত হলে শূন্য বাসগৃহে নায়কের সঙ্গে মিলিত হয়।

সামান্য নায়িকা তিন প্রকার :

সম্ভোগদুঃখিতা, বিকৃতকৃতা ও মানবতী।

সম্ভোগদুঃখিতা—দূতীর সঙ্গে নায়কের সহবাসের পরিচয় পেয়ে দুঃখিতা।

বিকৃতকৃতা—আমার মত দুঃখী আর নেই এই ভাবযুক্তা। এটি দুই প্রকার : প্রেমকৃতা ও সৌন্দর্যকৃতা।

প্রেমকৃতা—নায়ক যাকে বেশী কামনা করে। স্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় থাকলেও মনে মনে তার প্রতি অপ্রসন্ন।

মানবতী—অপরের সঙ্গে সহবাসকৃত নায়কের প্রতি মানযুক্তা।

তিন নায়িকা—স্বকীয়া, পরকীয়া ও সামান্যা—এদের প্রকারভেদ সম্বন্ধে বলা হল। এই তিনটির আবার আরও আটটি প্রকারভেদ হতে পারে।

প্রোষিতভর্তৃকা—যার স্বামী প্রবাসে আছে।

খণ্ডিতা—যার স্বামী পরকে উপভোগ করে সেই চিহ্নসহ স্ত্রীর কাছে আসে। স্ত্রী ক্রুদ্ধ হয়ে তার হাতে একটি আয়না প্রদান করে। নায়ক বখ্‌শু এই নায়িকাকে অবলম্বন করে চমৎকার ধ্রুপদ রচনা করেছিলেন। নিচের দুটি কলিতে এই নায়িকার উল্লেখ আছে। এটি সুহু রাগে নিবদ্ধ। আরোহণে ঔড়ব।

নয়া রঙ্গ্ মকীন্ আওত দেখ্ পিয়ারী অধর কর।
দর্পণমহল মে লে আয়ী
যব্‌হিঁ পিয়ার ও নিজহ চিন্ চিন্
সখী তব্ মুখ মোড়্ মোড়্ মুস্‌কাইন্।

একে প্রৌঢ়া খণ্ডিতাও বলা হয়ে থাকে।

কলহান্তরিতা—অপর সহবাসকৃত নায়ককে তীব্র তিরস্কারের পর অনুতপ্তা।

বিপ্রলব্ধা—নতুন মিলনস্থানে প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত না হওয়ায় ব্যথিতা।

উৎকণ্ঠিতা—প্রিয় আসছে না এই কারণে চিন্তান্বিতা। একে "উৎকার"ও বলা হয়।

বাসকসজ্জা—প্রিয় আসবে ও মিলিত হবে এই অপেক্ষায় আহ্লাদিত চিত্তে সুসজ্জিত হয়ে প্রতীক্ষমাণা।

স্বাধীনভর্তৃকা—প্রিয় যার ইচ্ছার অধীন।

অভিসারিকা—যে নিজেই প্রিয়ের কাছে ত্বরান্বিত হয়ে গমন করে।

প্রোষিতভর্তৃকা সেই ক্ষেত্রেও হবে যে ক্ষেত্রে নায়িকার প্রিয়ব্যক্তি ভ্রমণে যেতে ইচ্ছুক কিন্তু নায়িকা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে তাকে অন্যভাবে নির্দিষ্ট করছে ; যদিচ আসলে তার কোনও কারণ নেই।

সখী—দীর্ঘকালের পরিচারিকা যার উপর আস্থা স্থাপন করা যায়। নায়িকার সেবায় আত্মনিযুক্তা ; তার আনন্দে আহ্লাদিতা এবং চিন্তা অপনোদনে নিযুক্তা। এরা হাস্যপরিহাসে নায়ক-নায়িকার সখ্যতা বৃদ্ধি ও মিলন সংঘটিত করে।

যদি কোনও স্ত্রীলোক নায়ক-নায়িকার সংবাদ বিনিময় করে তা হলে তাকে দূতী বলে। যদি এই কাজ পুরুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় তা হলে তাকে দূত বলা হয়। এই ব্যক্তি মিলনের দিন ও বিচ্ছেদ সম্বন্ধে জ্ঞাত। সখ্যতা ও অসখ্যতা সম্বন্ধে এর ভালরকম জানা আছে; নায়ক-নায়িকার বিভিন্নতা অনুসারে মনোহারী কাহিনীতে তাদের আনন্দ প্রদান করে। এরা অভীষ্ট প্রণয়পাত্রের সঙ্গে মিলনসাধনে পটু এবং পত্র লেখায় অভিজ্ঞ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এই অধ্যায়ে গায়কদের দোষের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। জিজ্ঞাসু ব্যক্তির কাছে এটি যেন গোপন না থাকে যে গায়কদের দোষ পঁচিশ প্রকার। দোষগুলি এই: সন্দষ্ট, উদ্‌ঘুষ্ট, সুৎকারী, ভীত, শঙ্কিত, কম্পিত, করালী, বিকল, কাকী, বিতাল, করভ, অধির (উদ্ভট হওয়া উচিত), বোম্বক, তুম্বকী, বক্রী, প্রসারী, বিনিমীলক, বিরস, অপস্বর, অব্যক্ত, স্থানভ্রষ্ট, অব্যবস্থিত, মিশ্রক, অনবধান, সানুনাসিক।

দাঁত চেপে গান করাকে সন্দষ্ট বলে। খুব উঁচুগলায় গান করাকে উদ্‌ঘুষ্ট বলে। দাঁতে দাঁতে চেপে উঁচু দিকে নিশ্বাস টেনে "সুৎ" আওয়াজের সঙ্গে গান করাকে সুৎকারী বলে। গান করতে গিয়ে সাহসে কুলোচ্ছে না এমন দেখা গেলে তাকে ভীত বলে। ত্বরান্বিত হয়ে গান করলে তাকে শঙ্কিত বলে। গানের সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপতে থাকলে তাকে কম্পিত বলে। মুখ ফাঁক করে সমস্ত দন্ত উদ্‌ঘাটিত করে গাওয়াকে করালী বলে। গাইবার সময় সুর কম বেশী হলে তাকে বিকল বলে। কাকের মত কর্কশ আওয়াজ হলে তাকে কাকী বলে। তালের আন্দাজ না থাকলে তাকে বিতাল বলে। উটের মত ঘাড় উঁচু করে গান করাকে করভ বলে। ছাগলের মত আওয়াজ হলে তাকে অধির (এটিকে রত্নাকরে 'উদ্ভট' বলা হয়েছে) বলে। শির, কপাল, গ্রীবা, মুখ বিকৃত করে গাওয়াকে বোম্বক বলে। তুম্ব বা লাউ-এর মত গলা ফুলিয়ে গাওয়াকে তুম্বকী বলে। গলা বক্র করে গাওয়াকে বক্রী বলে। গাওয়ার সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শ্লথ এবং স্বর শ্লথ হলে তাকে প্রসারী বলে। চোখ বুঁজে গান করাকে বিনিমীলক বলে। গানে রস ও রঞ্জকতা না থাকলে তাকে বলে বিরস। গানের সময় ঠিক সুর রক্ষা না করে কম করলে তাকে অপস্বর বলে[১]। গানের সময় কথাগুলি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত না হলে এবং

১ এটি যথার্থ ব্যাখ্যা নয়। বর্জ্য বা নিষিদ্ধ স্বরে গান করাকেই অপস্বর বলা হয়।

কণ্ঠনলী থেকে স্পষ্ট ধ্বনি নির্গত না হলে তাকে অব্যক্ত বলে। মন্দ্র, মধ্য ও তার—এই তিন স্থানে গলা পৌঁছোতে অশক্ত হলে তাকে স্থানভ্রষ্ট বলে। উক্ত তিনটি স্থানের একটিতেও যথাযথভাবে সুর লাগাতে সক্ষম না হলে তাকে অব্যবস্থিত বলে।[১] শুদ্ধ, ছায়ালগ প্রভৃতি রাগগুলিকে একত্র (অর্থাৎ মিশ্রিত) করে ফেললে তাকে মিশ্রক বলে। সঞ্চারী ও আস্থায়ী—এ সব সম্বন্ধে অবহিত না থাকলে তাকে অনবধান বলে। সানুনাসিক সম্বন্ধে গ্রন্থে কিছু বলা হয় নি। তবে বলা বাহুল্য, নাকী সুরকেই সানুনাসিক বলা হয়।

সপ্তম অধ্যায়

কণ্ঠ ও আওয়াজের পার্থক্য নিরূপণ এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। অভিজ্ঞগণ কণ্ঠের চারটি প্রকারভেদ নির্দিষ্ট করেছেন। এইগুলি জানা বিশেষ প্রয়োজন। এইগুলি হচ্ছে—খাহুল, নারাট, বোম্বক[২] ও মিশ্রিত।

কণ্ঠের কফযুক্ত মেজাজ হলে তাকে খাহুল বলে। এর তিনটি গুণ নির্ধারণ করা হয়েছে। স্নিগ্ধ[৩]—অর্থাৎ চর্বিযুক্ত গম্ভীর আওয়াজ; মধুর অর্থাৎ মিষ্ট আওয়াজ, সুকুমার অর্থাৎ মোলায়েম আওয়াজ। খাহুল ধ্বনি মন্দ্র এবং মধ্য সপ্তকে পরিব্যাপ্ত হলে তাকে আডিল্ল[৪] বলে। যে গলা আরও উঁচুতে ওঠে তাকে বলে নারাট। এর চারটি গুণ। ত্রিস্থান অর্থাৎ মন্দ্র, মধ্য এবং তার—এই তিনটি স্থান। ঘন অর্থাৎ অন্তঃসারতাযুক্ত। গম্ভীর অর্থাৎ গভীর এবং ব্যাপক আওয়াজ। লীন অর্থাৎ নরম ও মোলায়েম আওয়াজ। যে কণ্ঠে শ্বাস বা হাওয়া গানের মেজাজকে অবরুদ্ধ করে তাকে বোম্বক বলে। এটি চার প্রকার। নিঃসার অর্থাৎ দুর্বল ও ঢিলে আওয়াজ। পরুষ অর্থাৎ শুষ্ক আওয়াজ। উচ্চ[৫] অর্থাৎ চড়া আওয়াজ। স্থূল[৬] অর্থাৎ শক্তিহীন আওয়াজ। কফজ, বাতজ এবং স্থূল—কণ্ঠে এই তিনটির সংমিশ্রণ হলে তাকে মিশ্রিত বলে।

প্রশ্ন—খাহুল চর্বিযুক্ত (স্নিগ্ধ) গুণসম্পন্ন এবং বোম্বক গুরুতাবিশিষ্ট

১ এই ব্যাখ্যাটিও যথাযথ নয়। আসলে স্থানত্রয়ে ব্যবস্থিত ভাবে অর্থাৎ প্রত্যয়ের সঙ্গে স্বর লাগাতে না পারলে তাকে অব্যবস্থিত বলা সঙ্গত।

২ এটি "ইউবঙ্ক্" লিখিত হয়েছে।

৩ এটি "সুগন্ধ" লিখিত হয়েছে।

৪ এটি "আদল্" লিখিত হয়েছে।

৫ এটি "আজ" লিখিত হয়েছে।

৬ এটি "আম্বল" লিখিত হয়েছে।

হওয়াতে চর্বিযুক্ত এবং শুষ্কতা পরস্পরবিরোধী। তা হলে এ দুটির একত্রকরণ কিভাবে সমুচিত বিবেচিত হচ্ছে ?

জবাব—বিরুদ্ধতাকে বাদ দিয়েই এই মিশ্রণ সম্ভব হবে। নারাট, বোম্বক, ঘন ও নিঃসার—এগুলির একটির সঙ্গে আর একটির যখন মিশ্রণ হবে তখন বিরুদ্ধতাগুলিকে পরিহার করে এই কাজ করতে হবে।

এই প্রশ্ন ও জবাবের বিশেষ অর্থ ও ব্যুৎপত্তি খাজা মুহম্মদ সলাহ্ সলমিয়া তাঁর নিবন্ধ এল্‌মে মৌসিকী-তে লিখে গেছেন। রাগপ্রকাশ-এ এটি লিপিবদ্ধ হয়েছে। মিশ্রিতও চার প্রকার। নারাট-খাহুল হচ্ছে উত্তম। এর অংশদুটিতে নিঃসারতা এবং পরুষতা নেই। মিশ্রকের মধ্যে বোম্বক-খাহুল হচ্ছে মধ্যম শ্রেণীর। নারাট-বোম্বক হচ্ছে অধম শ্রেণীভুক্ত। বোম্বক ও নারাট মিশ্রিতের মধ্যে যদি নিঃসার ও পরুষতা থাকে তা হলে সেটি অতি নিকৃষ্ট। শিক্ষার্থীদের কাছে এটি যেন গোপন না থাকে যে আওয়াজ সম্বন্ধীয় তথ্য কণ্ঠের গুণ সম্পাদনের জন্য জানা প্রয়োজন এবং এই কটি শব্দের অর্থ জানাই যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থীদের এই প্রয়োজন মেটাবার জন্যই ভরতসঙ্গীত প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিত হয়েছে।

কণ্ঠের গুণ পনেরটি : মৃষ্ট, মধুর, চেহাল, ত্রিস্থানক, সুখাবহ, প্রচুর, কোমল, গাঢ়, শ্রাবক, করুণ, ঘন, স্নিগ্ধ, শ্লক্ষ্ণ (স্লুহ্ন্), রক্তিযুক্ত, অস্থমান[১]।

মৃষ্ট—গানের সময় শ্রোতা আনন্দ লাভ করেন। মন্দ্র, মধ্য, তার—এই তিন স্থানেই কণ্ঠ পরিব্যাপ্ত হয়।

মধুর—কণ্ঠ সোজা তার স্থানে পরিভ্রমণ করে এবং মিষ্টতাসম্পন্ন।

চেহাল—চর্বিযুক্ত এবং বেশী সরু নয়। গলা ও নিশ্বাস সঙ্কুচিত করে গাইলে এই স্বরটি উৎপন্ন হয়।

ত্রিস্থানক—তিনটির (অর্থাৎ মন্দ্র, মধ্য, তার) প্রত্যেকটি স্থানে কণ্ঠের ব্যাপ্তি এবং তা চিত্তাকর্ষক।

সুখাবহ—যে আওয়াজ চিত্তকে আরাম প্রদান করে।

প্রচুর—স্থূল আওয়াজ।

কোমল—কোয়েলের মত আওয়াজ।

গাঢ়—প্রাণশক্তিযুক্ত ও ক্ষমতাসম্পন্ন আওয়াজ।

শ্রাবক—যে আওয়াজ দূরে পৌঁছায় এবং উঁচু।

১ রত্নাকরে এটি "স্থবিনান" আছে।

করুণ—যে আওয়াজ শুনলে করুণার ভাব উদয় হয়।

ঘন—ভরাট গলা যা দূরে পৌঁছায়।

স্নিগ্ধ—চর্বিযুক্ত কণ্ঠস্বর যা দূরপ্রসারী।

শ্লক্ষ্ণ—যে কণ্ঠের ঘনত্ব ব্যাহত হয় না, একভাবে সুগ্রথিত অবস্থায় থাকে।

রক্তিযুক্ত—চিত্তাকর্ষক এবং জোরালো আওয়াজ।

অস্থমান—পরিষ্কার এবং দীপ্তিসম্পন্ন।

কণ্ঠের দোষ আট প্রকার—রুক্ষ, স্ফুটিত, নিঃসার, কাকোলী, কেটি, কেনি, কৃশ ও ভগ্ন।

রুক্ষ—যে কণ্ঠ শেষের দিকে ভেঙে যায় এবং শুষ্ক লাগে।

স্ফুটিত—যে আওয়াজ ছাড়া ছাড়া বোধ হয়।

নিঃসার—ঢিলে এবং ক্ষীণ আওয়াজ।

কাকোলী—কাকের মত আওয়াজ। কানে রূঢ় ঠেকে।

কেটি (কীৎ)—যে আওয়াজ মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন স্থানের কোনটিতে ঠিক পৌঁছোতে সমর্থ হয় না। এতে মাধুর্যগুণ থাকে না।

কেনি (কীন্)—মন্দ্র ও তারস্থানে আওয়াজ যেরকম হওয়া উচিত তার চেয়ে বেশী হয়ে যায়।

কৃশ—সৌন্দর্যহীন সূক্ষ্ম আওয়াজ।

ভগ্ন—গর্দভ বা উটের মত আওয়াজ।

অভ্যাস ছাড়াই স্বাভাবিক প্রতিভাবলে রাগ অভিব্যক্তির ক্ষমতাকে শারীর বলে।

দুর্বল, ঢিলে, শুষ্ক, চিত্তবিকর্ষক, বিশ্রী, কাকী, সুরভ্রষ্ট, মেধাহীন, কর্কশ, অমসৃণ ও হেঁড়ে আওয়াজকে কুশারীর বলে। বেশীরভাগ অপটু এবং অশিক্ষিত গায়ক এইরকম হয়।

অষ্টম অধ্যায়

যে সকল কর্তব্য অনুষ্ঠান করে গায়ক সাফল্য অর্জন করে এই অধ্যায়ে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। গানের বিধিপ্রণালী, লক্ষণ, প্রয়োগ, ব্যবহারিক শব্দ—এইগুলিকে "প্রকীর্ণ" বলে। বাক্যাংশকে বাণী ও মাৎ (মাতু) বলা হয়। সঙ্গীতের অবয়বকে ধাৎ (ধাতু) বলা হয়। যে ব্যক্তি বাণী ও গীত এই দুই সম্বন্ধে উত্তমরূপে অভিজ্ঞ তাঁকে "বাগ্‌গেয়কার" এই ব্যবহারিক শব্দে বোঝানো হয়। বাগ্‌গেয়কার তিন শ্রেণীর।

নিম্নলিখিত গুণগুলি যাঁর আছে তিনি উত্তম বাগ্‌গেয়কার—

বাণী ও গীতের নিয়মপ্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি, কোষগ্রন্থে অধিকার, আওয়াজের বৈষম্য সম্বন্ধে জ্ঞান, কাব্যে জ্ঞান, বাক্‌চাতুর্য, রসভাব ইত্যাদিতে জ্ঞান, বিবিধ দেশীয় ভাষার সঙ্গে পরিচয়, শাস্ত্রে ও কলাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, সঙ্গীতরচনায় দক্ষতা, রাগ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান, প্রকাশে বলিষ্ঠতা, অনুসন্ধিৎসা, সঙ্গীতে অতিশয় উৎসাহ, প্রবন্ধগীত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, প্রাচীন মার্গসঙ্গীতে স্মৃতিসম্পন্নতা ও তৎসম্বন্ধীয় নিয়মাবলীতে অভিজ্ঞতা, গীত এবং বাদ্য ও নৃত্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা, লয় ও তাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, রাগ ও তালের বৈচিত্র্য প্রদর্শনে সমর্থতা, প্রত্যুৎপন্নতা, কাকুতে (ধ্বনিবিচার) দক্ষতা, রাগমিশ্রণে দক্ষতা, আলাপে ও গমকে দক্ষতা, তিন স্থানে কণ্ঠবিস্তৃতিতে সমর্থতা।

মধ্যম শ্রেণীর বাগ্‌গেয়কার—বাণীতে উত্তম নয়, গীতে দুর্বল কিন্তু ধাতু অর্থাৎ সঙ্গীতের অবয়বের (বা টেক্‌নিক) দিকে সার্থক।

অধম শ্রেণীর বাগ্‌গেয়কার—এঁরা সঙ্গীতের ধাতুকে প্রস্ফুটিত করতে তৎপর নন কিন্তু মাতু বা বাক্যাংশ ভালভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম।

সঙ্গীতে পারদর্শীদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এক—যাঁরা প্রত্যুৎপন্নতার সঙ্গে তাজা সঙ্গীত রচনায় সক্ষম; দ্বিতীয়—যাঁরা শব্দগুলি ভালভাবে গ্রথিত করতে পারেন কিন্তু তাজা সঙ্গীত রচনায় অসমর্থ (অর্থাৎ, মুখে মুখে গান বাঁধতে পারেন না)। গুণকার পর্যায়ের গায়কদের মধ্যম বলা যায়। এঁরা প্রাচীন সঙ্গীত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং রাগসমূহ ঠিক ঠিক দেখাতে পারেন। যাঁরা 'গান্ধর্ব' তাঁরা দেশী ও মার্গ দুই বিষয়েই পারদর্শী। অপর একটি শ্রেণী আছে 'সরাদ্' (স্বরাদি ?); তাঁরা বিশুদ্ধ রাগ ও মার্গ জানেন কিন্তু দেশী জানেন না।

অষ্টম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ

এতে গায়কদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে। এঁদের আওয়াজ চিত্তাকর্ষক হবে, সঙ্গীতকালে রুচির পরিচয় পাওয়া যাবে; গ্রহ-ন্যাস সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে; রাগ-অঙ্গ, ভাষা-অঙ্গ, ক্রিয়া-অঙ্গ, আলাপ-অঙ্গ সম্বন্ধে জানা থাকবে; প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে জানা থাকবে; আলাপ ও গমকের রীতিগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকবে; তিনস্থানে কণ্ঠ পরিভ্রমণে সক্ষম হবে, পরিবর্তনের নিয়মগুলি জানা থাকবে; অলঙ্কার প্রভৃতিতে দখল থাকবে; কোনও নিয়মের বিচ্যুতি ঘটবে না; কণ্ঠ

নিজের আয়ত্তে থাকবে; তাল সম্বন্ধে উত্তম ধারণা থাকবে; নিয়মানুসারে গান করবে; হুঁসিয়ার থাকবে; সঙ্গীতের তথ্যাদি জানা থাকবে; ওজস্বিতার সঙ্গে গান করতে পারবে; শুদ্ধ ও ছায়ালগ এই দুই প্রকার রাগ অবগত থাকবে; কাকু বা ধ্বনিবিকারে অভ্যাসের জন্য কণ্ঠ বিভিন্ন পর্দায় পরিভ্রমণে সক্ষম হবে; স্থায়ী সঞ্চারী প্রভৃতি অংশ নৈপুণ্যের সঙ্গে সম্পাদন করতে সমর্থ হবে গায়কদের যে সমস্ত দোষের উল্লেখ ইতঃপূর্বে করা হয়েছে সেগুলি থাকবে না; লয়বিদ্ ও বিশেষ রঞ্জকতাগুণসম্পন্ন হবে; অক্লেশে গান করতে সমর্থ হবে; উত্তম স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট হবে; সঙ্গীতে চতুর ও ত্বরান্বিত হবে; সঙ্গীতে সৌন্দর্য-সম্পাদনে সক্ষম হবে; যথাযথভাবে রাগনির্ণয়ে সমর্থ হবে;—এই রকম ব্যক্তিকে প্রথম শ্রেণীর গায়ক বলা হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণী। এঁদের মধ্যম বলা হয়। উপরে কথিত গুণগুলি এঁদের অনেকের মধ্যে আছে; অনেকের মধ্যে পূর্বোল্লিখিত কতকগুলি দোষও বর্তমান।

তৃতীয় শ্রেণী। এঁদের অধম বলা হয়। এঁরা দুর্বল প্রকৃতির। এঁদের কয়েকজনের মধ্যে উপরের গুণগুলি থাকতে পারে। তবে কিছু না কিছু দোষ এঁদের গানে থাকবেই।

এই তিন শ্রেণীর গায়ক ছাড়া আরও পাঁচ প্রকার গায়ক বর্তমান—শিক্ষাকার (সেচ্ছাকার), আঙ্কার (আন্-কার ?), রসিক, রঞ্জক ও ভাবক।

শিক্ষাকার হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা ওস্তাদদের কাছে নানা প্রণালী শিক্ষা করে অপরকে শিক্ষাদানে সমর্থ হন। আঙ্কারবর্গীয় ব্যক্তিগণ ওস্তাদের কাছে শিখে দস্তুরমত গাইতে পারেন কিন্তু নিজেরা কিছু রচনা করতে সমর্থ হন না। তবে এঁরাও ওস্তাদের কাছ থেকে নিয়মপ্রণালী শিক্ষা করে সেগুলি শেখাতে পারেন। যাঁরা শীঘ্র গানে পুলকসঞ্চার করতে পারেন তাঁরা রসিক। রঞ্জক হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা গানের সময় শ্রোতাদের বিশেষ সুখী করতে পারেন। ভাবক তাঁরা, যাঁরা সব রাগ নিয়মানুসারে সুন্দরভাবে গাইতে পারেন এবং গানও বাঁধতে পারেন।

এই সর্বপ্রকার শ্রেণী এবং বিভাগাদির মধ্যে আরও তিনটি শ্রেণী আছে, একল, যমল এবং বৃন্দ।

একল—যখন গায়ক একাই রাগাভিব্যক্তিতে সমর্থ হন।

যমল—যখন গায়ক অপর একজনের সঙ্গে একত্রে গান করেন; কিন্তু একজনই রাগাভিব্যক্তি ও সঙ্গীতের রূপ প্রদান করেন।

বৃন্দ—যখন গায়কের সঙ্গে একটি গোষ্ঠী সুরসহযোগিতা করেন এবং

বিধিসম্মতভাবে গান ও রূপ রক্ষা করেন। কিন্তু এই গোষ্ঠীর মধ্যে একজন অপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হবেন না। বৃন্দ স্ত্রী ও পুরুষ মিলিয়ে গঠিত হতে পারে কিন্তু স্ত্রীলোক থাকলে সুন্দরী ও যুবতী হওয়া বিধেয়।

নবম অধ্যায়

এতে বৃন্দ এবং বৃন্দসম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর আলোচনা রয়েছে। কয়েকজন গায়ক ও বাদকের একত্র সমাবেশে সম্পাদিত সঙ্গীতকে বৃন্দ বলা হয়। এই বৃন্দ তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ।

উত্তম—এতে চারজন মূল গায়ক, আটজন সাধারণ গায়ক, বারোজন সুকণ্ঠী গায়িকা, চারজন বাঁশরীবাদক, চারজন মৃদঙ্গবাদক থাকবে।

মধ্যম—উপরে উক্ত গায়ক ও বাদকদের অর্ধেক সংখ্যা নিয়ে গঠিত হবে।

কনিষ্ঠ—একজন গায়ক, একজন বাদক, মাঝামাঝি (অর্থাৎ সহযোগী) গায়ক তিনজন, চারজন সুকণ্ঠী গায়িকা, দুজন বাঁশরীবাদক, দুজন মৃদঙ্গবাদক থাকবে।

কেবলমাত্র সুকণ্ঠী স্ত্রীলোকদের নিয়েও দুই প্রকার বৃন্দ প্রস্তুত হয়।

উত্তম—দুজন পারদর্শী গায়িকা, দশজন মধ্যম পর্যায়ের গায়িকা, দুজন বংশীবাদিকা ও দুজন মৃদঙ্গবাদিকা থাকবে।

মধ্যম – একজন পারদর্শী গায়িকা, চারজন মধ্যমশ্রেণীর গায়িকা ও চারজন বংশীবাদিকা থাকবে।

এর চেয়ে কম ব্যক্তি থাকলে তাকে হীন-বৃন্দ বলা হয়। বৃন্দ সম্পর্কে এইটি নির্দিষ্ট রীতি; এর বিচ্যুতি সমর্থনযোগ্য নয়। যদি উত্তম বৃন্দ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক গায়ক ও বাদক জমা হয় তা হলে তাকে "কোলাহল" অর্থাৎ "শোরগোল" বলা হয়।

বৃন্দের ছটি গুণ। এগুলি হচ্ছে—মুখ্যগায়কের উত্তম অনুসরণে গান; পরস্পরের কণ্ঠস্বরে মিলন; সকলে মিলে একযোগে তানের রীতি রক্ষণ; একজনের স্বর অপর কর্তৃক যথাযথভাবে নির্বহন; তিন সপ্তকে পরিভ্রমণের সহায়তা সম্পাদন, দ্বিতীয় দলের (অর্থাৎ সহযোগীদের) কণ্ঠের দোষ প্রথম-দলের কণ্ঠকর্তৃক আচ্ছাদন। (এর অর্থ এই যে, একসঙ্গে গাইলে বিভিন্ন গায়কের কণ্ঠের বৈসাদৃশ্য ঢাকা পড়ে যায়।)

এতদ্ব্যতীত আরও কিছু ব্যক্ত হবে সম্রাট আকবরের সময়ে লিপিবদ্ধ রাগসাগর গ্রন্থটি থেকে। এই গ্রন্থে তৎকালীন গায়কগণের নির্দিষ্ট পদ্ধতি

লিখিত হয়েছে। মানকুতূহল ও রাগসাগর—এই দুই গ্রন্থের বর্ণনায় বেশ তফাৎ আছে। কেন না, সেই সময় (অর্থাৎ মানকুতূহলের সময়) নায়কগণ জীবিত ছিলেন। আকবরের সময় এমন ব্যক্তি খুব কম সংখ্যকই পাওয়া যেত যাঁরা বিদ্যায় রাজা মানের যুগের নায়কদের সমকক্ষতা দাবি করতে পারতেন। (গুয়েন্দ্ হায়ে জমানে আকবরী হিচ্ কুদাম্ দর্ এল্ম্ মিশল্ নায়েকান্ ওয়াকৃতে রাজা মান্ গুদন্দ।) এই সব নায়ক তাঁদের জ্ঞানের ও প্রয়োগশিল্পের যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার প্রমাণ এই নিবন্ধ। অপরপক্ষে আকবরশাহী জমানায় গায়কগণ আকছার আতায়ী হতেন। প্রয়োগের দিক থেকে যাঁদের কায়দা ওস্তাদের মত কিন্তু তা জ্ঞানসমৃদ্ধ নয় তাঁদের আতায়ী বলা হয়। (গুয়েন্দ্ হায়ী জমানে আকবরশাহী আক্সর্ আতায়ী বুদন্দ্। কোয়ায়েদে উয়ো ওস্তাদান্ অনিস্ত্ হর্কে এল্ম্ বে-এল্ম্ দাশ্ তা বাশদ্। উয়েরা আতায়ী গুয়েন্দ্।) এই হিসাবমত এঁদের উল্লেখ করা হচ্ছে।

মিয়াঁ তান্সেন।

সুজান্ খাঁ নওহার।

সুরগিয়ান্ খাঁ।

ফতেপুরী চান্দ্ খাঁ, সুরয্ খাঁ—এই দুই ভাই।

মিয়াঁ চান্দ্—রশীদ্ মিয়াঁ তানসেনের শিষ্য।

তানতরঙ্গ, বিলাস খাঁ—মিয়াঁ তানসেনের এই দুই পুত্র।

রামদাস মুণ্ডিয়া।

দাউদ্ খাঁ ঢাঢ়ী।

মহম্মদ খাঁ ঢাঢ়ী।

মদন রায় ঢাঢ়ী।

মুল্লা আস্হাক্ ঢাঢ়ী।

অনুসন্ধান করে যাঁরা বিদ্যা অর্জন করেন তাঁদের "মুল্লা" বলা হয়। (চুঁ তালিব্ এল্মে কর্দা বুয়াদ্ বিনাবরান্ মুল্লা মীগুয়েন্দ্)।

খিজির্ ও তাঁর ভ্রাতা নবাৎ খাঁ।

হুসন্ খাঁ পটন্নী—আফ্ঘান জাতীয় একজন ওমরাহ।

ইউসুফ্ জয়ীর[১] যুদ্ধে—রাজা বীরবলের মৃত্যুর পর ইনি সিপঞ্জী জানের কাছে সঙ্গীতানুষ্ঠান করতেন। এঁরা সকলেই আতায়ী ছিলেন।

১ রাজা বীরবর বা বীরবল ইউসুফ জয়ী আফঘানদের অতর্কিত আক্রমণে নিহত হন।

বাজ্ বাহাদুর—মালোয়ার শাসনকর্তা।

নায়ক চর্জু।

নায়ক ভগবান।

ধুণ্ডী।

সুরত সেন—তানসেনের প্রিয়পুত্র। (খলফ্-ই-অল্ সিদ্দিক মিয়াঁ তানসেন।)

লালা এবং দেবী—এঁরা বাকির্ খাঁর পুত্র বর্হমন (ব্রাহ্মণ) আকিলের দুই ভ্রাতা।

সুন্ বাচ্ছী।

এঁরা পদস্থ গায়ক ছিলেন কিন্তু নায়ক ভাহু, নায়ক পাণ্ডুয়ী ও নায়ক বখ্শুর মত শিক্ষিত ছিলেন না। কেন না সঙ্গীতবিষয়ে নায়কদের জ্ঞান প্রশংসনীয় ছিল।

পুরানো আমলের নায়কগণ কেদারায় (কুরসী) বসতেন; বীণা ও মৃদঙ্গবাদকগণ পিছন থেকে বাদ্যে তাঁদের অনুসরণ করতেন। তাঁরা সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতেন, সুর আবৃত্তি করতেন এবং তাল প্রভৃতি সবই অনুশীলন করতেন। তাঁরা যা গাইতেন তা শিষ্যদেরও শেখাতেন। এই সঙ্গীতের প্রসঙ্গে আর যা আসত তাও দেখিয়ে দিতেন। এই বৈঠকে অল্প-সংখ্যক গাইয়ে থাকতেন। এইভাবে বিদ্যা কাজে লাগত। গ্রন্থে যা বর্ণিত থাকত নায়ক তা বুঝিয়ে দিতেন যাতে সেগুলি শিক্ষার কাজে লাগে।

কেউ যদি কেবল পঠনপাঠনেই নায়কপদ প্রাপ্ত হন তা হলে যাঁরা পড়াশোনা করেন তাঁদের সবাইকেই নায়ক পর্যায়ভুক্ত করতে হয়। কিন্তু উক্ত কারণে এই ব্যক্তিদের নায়ক বলা হয় না, পণ্ডিত বলা হয়ে থাকে।

এঁদের সবাইকেই সম্মানের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

রাগসাগর গ্রন্থে যা লিখিত হয়েছে তা সমর্থিত নয়। আমি মানকুতূহল-এর তর্জমাই দেখিয়েছি। (উঞ্চে দর্ রাগসাগর্ গুফ্তা আন্দ্ মন্জুর্ ন-দাশতা। মানকুতূহলরা তর্জমা নমুদম্।)

দশম অধ্যায়

আমার সময়ে যে সব গায়ক ও বাদক জীবিত ছিলেন ও আছেন তাঁদের সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে লেখা হয়েছে।

১। শেখ্ বহাউদ্দীন্ বর্নাওয়া।

শাজাহান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার দুবছর পরে এঁর মৃত্যু হয়। ইনি অভিজাত-গৃহের সন্তান ছিলেন। পঁচিশ বৎসর বয়সে গৃহ পরিত্যাগ করতে মনস্থ করেন। ফকীরের মত থাকতেন। তিনি বন্দুকের গুলি থেকে একটি হরিণের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। হরিণটি তাকে বললে—"সাধারণ মানুষ এইসব কাজ করে, তুমি অন্য কাজ করতে সক্ষম।" শেখ্ কে কথা বলছে বোঝবার জন্য ডাইনে বাঁয়ে তাকালেন কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। হরিণ দুকদম এগিয়ে এসে আবার স্পষ্টভাষায় সেই কথা বললে। তিনি আবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন কে কথা বলছে বোঝবার জন্য কিন্তু কোনও ব্যক্তি তাঁর নজরে পড়ল না। হরিণ তখন কয়েক পা এগিয়ে তাঁর সামনে এসে বললে—"আমি হরিণ, আমিই বলেছি।" সে হরিণ হলেও সব কথা নিজের মুখেই বলেছিল। অতঃপর তিনি বন্দুক ফেলে দিয়ে তীর্থভ্রমণ করাই (সিয়াহৎ) মনস্থ করলেন।

(এইখানে জামীর একটি মসনবী উদ্ধৃত করা হয়েছে। এর অনুবাদ দেওয়া হল না।)

পঁচিশ বছর ধরে তিনি পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন এবং অনবরত ফকীরদের সঙ্গ করলেন। তিনি সঙ্গীতের রীতিনীতি শিখেছিলেন দক্ষিণ দেশে এবং বাদ্যশিক্ষাও করেছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি আবার বাড়ি ফিরলেন। তাঁর দেশ ছিল দোয়াবের অন্তর্বর্তী ঝিন্ঝিনা পরগণার বর্নাওয়া গ্রামে। দেশে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল। আশ্চর্যের বিষয় তিনি আবার শিকার আরম্ভ করলেন। তিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। তিনি স্ত্রীসংসর্গ করেননি এবং সবই ত্যাগ করেছিলেন। প্রায়ই সবুজ রঙের বিশেষ পোশাক পরিধান করতেন এবং বলতেন যে এই পরিচ্ছদে আল্লার বাণী আমার কাছে পৌঁছায়।

মার্গসঙ্গীতে তাঁর মত জ্ঞান দক্ষিণে আর কারুর ছিল না। গীত, ধ্রুপদ ও খিয়াল তিনি সুন্দর রচনা করতে পারতেন। চুটকলা গাওয়া কঠিন বলা হয় কিন্তু এসব রচনাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি রবাব, বীণ ও অমৃতী ভাল বাজাতে পারতেন। তিনি খিয়াল নামে একটি বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করেন; কিন্তু এই বাজনা একটি অসাধারণ বাদ্য হিসাবে পরিগণিত হয়নি। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এই বাজনায় দক্ষ দুজন লেখকের সঙ্গে ছিলেন। এর যে দোষ দেখা গেছে সে হচ্ছে এই যে, বিশেষ শক্তিমান ব্যতীত এই বাজনা বাজানো যেত না। এই যন্ত্র কারুর কারুর পছন্দ হতে পারে কিন্তু গায়ক বা বাদকরা

একে পছন্দ করবেন না। তিনি একশো সতেরো বৎসর বয়সে নিজের বাড়িতে ফকীর পরিবেষ্টিত হয়ে পরলোকগমন করেন। এই সব সংবাদ আমি বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছি।

২। শেখ্ শের মহম্মদ্

দেশী সঙ্গীতে নূতনত্ব প্রদর্শন করেন। তিনিও ফকীরত্ব অবলম্বন করে ধনদৌলত পরিত্যাগপূর্বক বহাউদ্দিনের সঙ্গে থাকতেন। অল্প বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। শেখ্ নাসিরুদ্দিন রহমতুল্লার কাছে তিনি কাজ করতে থাকেন। সমস্ত কষ্ট সহ্য করে কালক্রমে তিনি তারুণ্যে উপনীত হলেন। তিনি নানা স্থানে তীর্থ উপলক্ষ্যে ভ্রমণ করেছিলেন। এই সময় লেখক তাঁকে দেখেন।

(এইখানে আত্তার-এর একটি বয়েৎ আছে। এটির অনুবাদ দেওয়া হল না।)

শেখ্ নাসিরুদ্দিন তাঁকে সঙ্গীতে বিশেষ অগ্রসর করে দিয়েছিলেন। এই কারণে কোন লোকই তাঁর চেয়ে অধিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বলে দাবি করতে পারত না। গায়নপদ্ধতিতে তিনি সুলতান হুসেন শর্কীর মত ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন। চুটকলার পদ্ধতি বিশ্লেষণ এবং খিয়াল গানে তিনি পারদর্শী ছিলেন। ধ্রুপদ ও তারানাও সৃষ্টি করতে পারতেন। সুলতান হুসেন শর্কী যেসব গানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন শেখ্ সেই সব রীতিতে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। সঙ্গীতে তাঁর সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। পাটনায় ছাপান্ন বৎসর বয়সে এঁর মৃত্যু হয়।

৩। মিয়াঁ ডালু ঢাঢী

শেখ্ শের মহম্মদের মত তিনিও দেশী সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলেন। লেখক এঁকে আকবরাবাদে (আগ্রা) দেখেছিলেন। তিনি এঁর মত ধ্রুপদ আর কারুর কাছে শোনেননি। এত সুন্দর উদার সঙ্গীত সে যুগের বড় বড় গায়কের মুখেও শোনা যেত না। আকবরাবাদে প্লুরিসি (জাতুল্ জম্ব্) রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

৪। লাল খাঁ কলাবন্ত

এঁর খেতাব ছিল গুণসমুদ্র খাঁ। ছেলেবেলা থেকে তানসেনের সঙ্গে থাকতেন। তানসেন এঁকে পছন্দ করতেন। তাঁর শিক্ষা হয়েছিল তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁর তত্ত্বাবধানে। বিলাস খাঁর কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিলাস খাঁর কাছে সঙ্গীতে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং স্বয়ং বিলাস খাঁর শিষ্যত্ব অর্জন করেন। মোট কথা, তিনি

গাইয়েদের মধ্যে প্রধান পরিগণিত হন। আশী থেকে নব্বই বৎসরের মধ্যে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

৫। জগন্নাথ

এঁর খেতাব কবিরায়। মিয়াঁ তানসেনের পর সঙ্গীত রচনায় এত দক্ষতা আর কারুর ছিল না। নটরাগে ধ্রুপদ গেয়ে ইনি মিয়াঁ তানসেনের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন। ইনি বিধর্মী।[১] তানসেন বলেছিলেন—এ যদি বেঁচে থাকে এবং এর এই সম্ভাবনা পরিণতি লাভ করে তা হলে সংগীতে আমার পরে এ আমার মত হবে। ইনি প্রায় শত বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

৬। মিসির্ মন্জন্ ঢাঢী

মিয়াঁ বিলাস খাঁর শিষ্যদের অন্যতম। সুলতান শুজার সঙ্গে থাকতেন। বাংলায় এঁর সমকক্ষ কমই ছিলেন। প্রায় ছিয়াশী বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ভাল গীতরচয়িতা ছিলেন।

৭। মীর্ সালে কাওয়াল

উচ্চশ্রেণীর গায়ক ছিলেন। দিল্লীতে বাস করতেন। প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে মারা যান। এঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল।

৮। হুস্ন্ খাঁ নওহার

গায়কদের মধ্যে অতুলনীয় ছিলেন। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

৯। গুণসেন

খেতাব নায়ক আফজল্। নায়ক ভাহুর নাতি। সঙ্গীতে উত্তম অধিকার ছিল। গীত মন্দ গাইতেন না। মার্গসঙ্গীতের তত্ত্বে সমসাময়িকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন। পঞ্চাশ থেকে ষাট বৎসর বয়সে কাশ্মীরে মারা যান। রচনায় মন্দ ছিলেন না।

১০। শেখ্ কামাল

রশীদ্ মিয়াঁ ডালুর শিষ্য। ১০৭৬ হিজরীতে (১৬৬৬—গ্রন্থের সমাপ্তিকালে) ইনি জীবিত আছেন। সিপাহীর কাজ করেন। কিছুকাল লেখকের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন। গায়কদের মধ্যে এঁর অনুসন্ধিৎসা আছে।

---

১ "হিন্দু" শব্দটি প্রয়োগ না করে লেখক "দীন্ বেগানা" অর্থাৎ অপরিচিত বা অস্বীকৃত ধর্ম—এই কথাটি প্রয়োগ করেছেন।

১১। বাখৎ খাঁ

গুজরাট কলাবন্ত। লেখক এঁকে দেখেছিলেন কিন্তু এঁর গান শোনেননি। তবে বিশিষ্ট বন্ধুগণ এঁর বিশেষ প্রশংসা করতেন। ইনি বিলাস খাঁর শিষ্যদের অন্যতম। এঁর শিষ্যদের মধ্যে বাসন্তী নামক এক কলাবন্তের গান শুনেছি। এঁর গান উত্তম। এইসব দিক দিয়ে বিচার করে তুলনায় এঁর স্থান নির্ধারিত করতে পারি। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে এঁর মৃত্যু হয়।

১২। রঙ্গ খাঁ কলাবন্ত

উঁচুদরের গায়ক ছিলেন। শাজাহানের সময়ে গায়নসমাজের অল্প কয়েকজনের মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হয় এবং তাঁর নাম স্মরণ করা হয়। আশী থেকে নব্বই বৎসরের মধ্যে এঁর মৃত্যু হয়। ইনি বহু ফকীরের সঙ্গ করতেন এবং তাঁদের সেবায় নিযুক্ত থাকতেন। ইনি আকবরের যুগের গায়কদের দেখেছিলেন।

১৩। খুশ্‌হাল্‌ খাঁ

লাল খাঁর পুত্র। পিতার খেতাব ইনিও অধিকার করেন। বর্তমান ১০৭৬ হিজরীতে (১৬৬৬) জীবিত আছেন। কলাবন্তদের মধ্যে এঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। সম্রাটের কাছে তাঁর আদর ও প্রতিপত্তি দীর্ঘকাল থাকবে।

১৪। ঘুলাম্‌ মহীউদ্দীন

অভিজাত ঘরের সন্তান। সিপাহীবৃত্তি ছেড়ে দরবেশ হয়ে যান। বর্তমানে জীবিত আছেন। সঙ্গীতরচনায় ভাল। বড়লোকরা আজকাল তাঁর প্রতি উদাসীন এবং তিনিও তাঁদের অপছন্দ করেন। বয়েৎ—তোমার ভয়ে তোমার দয়া ঘোষণা করেছি। তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি; এখন তোমার কথা ভাল করেই বলতে পারব।

১৫। সওয়াদ্‌ খাঁ ঢাঢ়ী

উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। ভাল সঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। তাঁর বাড়ি ফতেপুর ঝুনুঝুনওয়াতে। সেইখানেই তিনি মারা যান।

১৬। গুণ খাঁ কলাবন্ত

সুলতান শুজা শাজাহানের কাছে অনুরোধ করে এঁকে পেয়েছিলেন। বিবিধ সঙ্গীতে তাঁর দক্ষতা ছিল। বাংলায় তাঁর মৃত্যু হয়। মার্গসঙ্গীতে এঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল।

১৭। ওয়ালী ঢাঢ়ী

উত্তম গায়ক ছিলেন। আশী থেকে নব্বই বৎসরের মধ্যে আকবরাবাদে মারা যান।

১৮। সালিম্‌চান্দ্‌ ডাগর্‌

উত্তম গায়ক ছিলেন। নানারকম সঙ্গীতে দক্ষ ছিলেন।

১৯। শেখ সাদুল্লা লাহোরী

অনুসন্ধিৎসু এবং জ্ঞানসম্পন্ন সঙ্গীতজ্ঞ। মিষ্টি করে গাইতে পারেন। এখনও জীবিত আছেন। লেখকের সঙ্গে থেকেছেন। লোকের সঙ্গে না মিশে একা থাকেন। অধিক পরিমাণে আফিং সেবন করেন। বয়স ষাট অতিক্রম করেছে। এই কারণে গানে দোষ এসে গেছে।

২০। মুহম্মদ বাকী

জাতিতে মুঘল। উত্তম সঙ্গীত রচনা করেন। বর্তমানে জীবিত আছেন কিন্তু আফিং সেবন করে অন্ত্র নষ্ট হয়ে গেছে। বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ।

২১। পূজা

শেখ্‌ শের মহম্মদের ভাই। উত্তম গায়ক ছিলেন। তাঁর কিছু রচনা ভাল নয়। কিছু ভিন্ন ধরনের রচনা আছে। ভগন্দর রোগ ছিল। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে রাজধানীতে মারা যান।

২২। বাজিদ্‌ খাঁ (নওছাওরী কলাবন্ত্‌।)

উত্তম গায়ক ছিলেন। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে মারা যান।

২৩। রওরা কাওয়াল্‌

উত্তম গায়ক। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে মারা যান।

২৪। কবীর্‌ কাওয়াল

শেখ্‌ শের্‌ মহম্মদের শিষ্য। বর্তমানে জীবিত আছেন। সুন্দর গান করেন। বয়স হয়েছে। বিচারক হিসাবে সুনাম আছে।[1]

২৫। মালতীরাম চলাবন্ত

বিধর্মী। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে মৃত্যু হয়।

২৬। ধরমদাস কলাবন্ত

বিধর্মী। উত্তম গায়ক ছিলেন। পরিণত বয়সে মৃত্যু হয়। গায়ক

১ সম্ভবতঃ পেশায় ইনি বিচারক ছিলেন।

সম্প্রদায়ে তাঁর স্বীকৃতি ছিল। চাকরি ছেড়ে আকবরাবাদে সাধুর মত নিরালায় বাস করতেন। এই অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

২৭। রহীমদাদ্ ঢাঢ়ী

সুন্দর গীত রচনা করেন। মার্গসঙ্গীতে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আছে। বর্তমানে জীবিত তবে বার্ধক্যগ্রস্ত হয়েছেন।

২৮। কব্জুৎ ঢাঢ়ী (কবি যুবৎ ঢাঢ়ী ?)

এঁর রচনাকে সম্মানপ্রদান করা হত। ফুলওয়ার-এ এঁর বাড়ি। আশী থেকে নব্বই-এর মধ্যে এঁর মৃত্যু হয়।

২৯। ঈদল সিং

রাজা রোজ আফ্জুন্-এর পুত্র; রাজারাম সাহার পৌত্র। ইনি খড়্গপুরের[১] শাসনকর্তা। এঁর খেতাব দৌলৎ আফ্জুন্। ইনি জ্ঞানে মীর খুস্রও বা সুলতান শর্কীর সমতুল্য। এখনও জীবিত আছেন। মাঝে মাঝে লেখককে গান শুনিয়ে খুশী করেন। এঁর তুলনা নেই। স্বাভাবিকভাবে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন। এঁর রচনাগুলি মিষ্ট। খিয়াল এবং তরাণাও রচনা করেন।

৩০। মীর ইমাদ্

হিরাতের সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূত। এঁর পিতা দেশ ছেড়ে এসেছিলেন। ভাল গান রচনা করতে পারেন। এখনও জীবিত আছেন।

৩১। হমীর সেন ও তাঁর পুত্র সুবল সেন

কৃতী কলাবন্ত ছিলেন। এঁদের পিতৃপুরুষ আকবরের যুগের কলাবন্তদের দেখেছিলেন। হমীর প্রায় আশী বৎসর বয়সে মারা যান। ছেলের (সুবল) চল্লিশ বৎসর না পৌঁছোতেই দাঁত পড়ে যায় এবং সম্ভবতঃ পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

৩২। রসীদ্ খাঁ নওহার

সুজান খাঁর পৌত্র। দীর্ঘজীবন লাভ করেছেন এবং এখনও জীবিত। গীত মন্দ গান না তবে ধ্রুপদেই পারদর্শী। জ্ঞানে মীর খুস্রও-এর তুল্য।

৩৩। সৈয়দ্ তবীব্ (তাখাল্লুস্ বা ছদ্মনাম বুধ্)

ঝারসা পরগনায় নিবাস। রাজধানীর গায়কদের মধ্যে এঁর বাণী (অর্থাৎ গানের উচ্চারণ) ভাল ছিল কিন্তু গলার আওয়াজ খোলা ছিল না। চল্লিশ

---

১ এই খড়্গপুর বিহারে অবস্থিত।

থেকে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের মধ্যে আকবরাবাদে এঁর বিশেষ প্রাধান্য ছিল।

৩৪। সুন্দর ঘুন্

বিধর্মী। উত্তম সঙ্গীত রচয়িতা। গায়কও মন্দ ছিলেন না। ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে মারা যান।

বাদকগণের পরিচয়

৩৫। সরস বীণ

বর্তমান ১০৭৬ (১৬৬৬) হিজরীতে জীবিত আছেন। সম্রাট এঁকে পছন্দ করেন। এঁর পিতামহ আকবরের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। তখন তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর পিতা জাহাঙ্গীরের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। ইনিও অতুলনীয় ছিলেন। তাঁর পুত্রও এ যুগে তুলনাহীন। এঁর বয়স হয়েছে। মাঝে মাঝে ইনি লেখককে পরিতুষ্ট করেন।

৩৬। বায়েজিদ্ রব্বাণী।

উঁচুদরের বাদক ছিলেন। অতিরিক্ত মদ্যপানে সত্বর মৃত্যুবরণ করেন।

৩৭। সুখর সেন

বায়েজিদের প্রিয় শিষ্য। রবাব বাজান। এখনও জীবিত আছেন। সম্রাট তাঁর প্রতি অনুরক্ত। ভগবান তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন।

৩৮। সালিহ্ রব্বাণী ঢাঢ়ী

পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। মোলায়েম করে বাজাতে ইনি অদ্বিতীয়। লেখকের সঙ্গে ইনি ছিলেন। রাজধানীতে এঁর পসার বেশী। বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে।

৩৯। মৃদঙ্গ রায়।

এটি খেতাব। নাম রুপায়ী। বিধর্মী। সম্রাট তাঁর প্রতি অনুরক্ত। মার্গসঙ্গীতে এঁর জ্ঞান আছে। এখনও জীবিত। সমসাময়িক বাদকদের মধ্যে ক্ষমতাসম্পন্ন।

৪০। ফিরোজ ঢাঢ়ী।

পাখাওয়াজী। এঁর বাদন নিখুঁত ছিল। লাহোরের অধিবাসী। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে এঁর মৃত্যু হয়।

৪১। তাহির্ দফ্নওয়াজ্ ঢাঢ়ী

এঁর সমকক্ষ আর কারুর বাজনা শোনা যায়নি। সত্তর থেকে আশীর মধ্যে মারা যান।

সম্প্রদায়ে তাঁর স্বীকৃতি ছিল। চাকরি ছেড়ে আকবরাবাদে সাধুর মত নিরালায় বাস করতেন। এই অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

২৭। রহীম্‌দাদ্‌ ঢাঢ়ী

সুন্দর গীত রচনা করেন। মার্গসঙ্গীতে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আছে। বর্তমানে জীবিত তবে বার্ধক্যগ্রস্ত হয়েছেন।

২৮। কব্‌জুৎ ঢাঢ়ী (কবি যুবৎ ঢাঢ়ী ?)

এঁর রচনাকে সম্মানপ্রদান করা হত। ফুলওয়ার-এ এঁর বাড়ি। আশী থেকে নব্বই-এর মধ্যে এঁর মৃত্যু হয়।

২৯। ঈদল সিং

রাজা রোজ আফ্‌জুন্‌-এর পুত্র; রাজারাম সাহার পৌত্র। ইনি খড়্গপুরের[১] শাসনকর্তা। এঁর খেতাব দৌলৎ আফ্‌জুন্‌। ইনি জ্ঞানে মীর খুস্‌রও বা সুলতান শর্কীর সমতুল্য। এখনও জীবিত আছেন। মাঝে মাঝে লেখককে গান শুনিয়ে খুশী করেন। এঁর তুলনা নেই। স্বাভাবিকভাবে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন। এঁর রচনাগুলি মিষ্ট। খিয়াল এবং তরাণাও রচনা করেন।

৩০। মীর ইমাদ্‌

হিরাতের সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূত। এঁর পিতা দেশ ছেড়ে এসেছিলেন। ভাল গান রচনা করতে পারেন। এখনও জীবিত আছেন।

৩১। হমীর সেন ও তাঁর পুত্র সুবল সেন

কৃতী কলাবন্ত ছিলেন। এঁদের পিতৃপুরুষ আকবরের যুগের কলাবন্তদের দেখেছিলেন। হমীর প্রায় আশী বৎসর বয়সে মারা যান। ছেলের (সুবল) চল্লিশ বৎসর না পৌঁছোতেই দাঁত পড়ে যায় এবং সম্ভবতঃ পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

৩২। রসীদ্‌ খাঁ নওহার

সুজান খাঁর পৌত্র। দীর্ঘজীবন লাভ করেছেন এবং এখনও জীবিত। গীত মন্দ গান না তবে ধ্রুপদেই পারদর্শী। জ্ঞানে মীর খুস্‌রও-এর তুল্য।

৩৩। সৈয়দ্‌ তবীব্‌ (তাখাল্লুস্‌ বা ছদ্মনাম বুধ্‌)

ঝারুসা পরগনায় নিবাস। রাজধানীর গায়কদের মধ্যে এঁর বাণী (অর্থাৎ গানের উচ্চারণ) ভাল ছিল কিন্তু গলার আওয়াজ খোলা ছিল না। চল্লিশ

১ এই খড়্গপুর বিহারে অবস্থিত।

থেকে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের মধ্যে আকবরাবাদে এঁর বিশেষ প্রাধান্য ছিল।

৩৪। সুন্দর ঘুন্‌

বিধর্মী। উত্তম সঙ্গীত রচয়িতা। গায়কও মন্দ ছিলেন না। ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে মারা যান।

বাদকগণের পরিচয়

৩৫। সরস বীণ

বর্তমান ১০৭৬ (১৬৬৬) হিজরীতে জীবিত আছেন। সম্রাট এঁকে পছন্দ করেন। এঁর পিতামহ আকবরের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। তখন তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর পিতা জাহাঙ্গীরের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। ইনিও অতুলনীয় ছিলেন। তাঁর পুত্রও এ যুগে তুলনাহীন। এঁর বয়স হয়েছে। মাঝে মাঝে ইনি লেখককে পরিতুষ্ট করেন।

৩৬। বায়েজিদ্‌ রব্‌বাণী।

উঁচুদরের বাদক ছিলেন। অতিরিক্ত মদ্যপানে সত্বর মৃত্যুবরণ করেন।

৩৭। সুখর সেন

বায়েজিদের প্রিয় শিষ্য। রবাব বাজান। এখনও জীবিত আছেন। সম্রাট তাঁর প্রতি অনুরক্ত। ভগবান তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন।

৩৮। সালিহ্‌ রব্‌বাণী ঢাঢ়ী

পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। মোলায়েম করে বাজাতে ইনি অদ্বিতীয়। লেখকের সঙ্গে ইনি ছিলেন। রাজধানীতে এঁর পসার বেশী। বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে।

৩৯। মৃদঙ্গ রায়।

এটি খেতাব। নাম রূপায়ী। বিধর্মী। সম্রাট তাঁর প্রতি অনুরক্ত। মার্গসঙ্গীতে এঁর জ্ঞান আছে। এখনও জীবিত। সমসাময়িক বাদকদের মধ্যে ক্ষমতাসম্পন্ন।

৪০। ফিরোজ ঢাঢ়ী।

পাখাওয়াজী। এঁর বাদন নিখুঁত ছিল। লাহোরের অধিবাসী। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে এঁর মৃত্যু হয়।

৪১। তাহির্‌ দফ্‌নওয়াজ্‌ ঢাঢ়ী

এঁর সমকক্ষ আর কারুর বাজনা শোনা যায়নি। সত্তর থেকে আশীর মধ্যে মারা যান।

৪২। ইলাহ্‌দাদ্ ঢাঢ়ী।

সারেঙ্গী বাজাতেন। আডমতর্‌ড্‌ থেকে এসেছিলেন। এটি দো-আবাহ্‌ জালন্ধরের অন্তর্বর্তী গ্রাম। এঁর সমকক্ষ আর কাউকে শোনা যায়নি। পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে মৃত্যু হয়।

৪৩। রসবীণ।

এটি খেতাব। নাম মুহম্মদ। মোলায়েম করে বাজনা বাজান। এখনো জীবিত আছেন।

৪৪। শউকী।

তম্বুর[১] বাদক। অতুলনীয় ছিলেন। এঁর সমকক্ষ আর কাউকে শোনা যায়নি। হিন্দী এবং ফার্সী দুই ধরনেই বাজাতে পারতেন। কাশ্মীরে মারা যান।

৪৫। তারাচাঁদ কলাবন্ত।

শউকীর প্রিয়শিষ্যদের অন্যতম। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে এঁর মৃত্যু হয়।

৪৬। আবু লুফা।

ততার খাঁ সফ্‌রাচীর পুত্র। ভাল তম্বুর বাজাতে পারতেন। ষাট বৎসরে পৌঁছেছেন। রাজধানীতে এঁর যথেষ্ট পসার ছিল।

৪৭। সুরদাস।

পাখাওয়াজী। বিধর্মী। আকবরের যুগের ব্যক্তি। মিয়াঁ তানসেনের সঙ্গে বাজিয়েছিলেন (বা মিয়াঁ তানসেন নওয়াখ্‌তা)। সম্প্রতি লেখক তাঁকে দেখেছিলেন। বহুদিন বেঁচে থাকার পর তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বাজনা থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। প্রায় শত বৎসরে পৌঁছেছিলেন।

শাজাহানের রাজত্বে একজন পুরুব সুর্ণা (শানাই) বাদক ছিলেন। তিনি জোয়ান অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করেন। লেখবার সময় তাঁর নাম মনে পড়ছে না। আর একজন অতুলনীয় সুর্ণাবাদক তাঁর পুত্রের সঙ্গে শাজাহানের সময়ে ছিলেন, তাঁর নামটিও আমার স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। আরও বাদক ও গায়ক ছিলেন, যাঁদের ফকীর (লেখক) দেখেননি এবং তাঁরাও সম্রাট শাজাহানের সাক্ষাতে আসেননি। যাঁরা আমার বাদশার কাছে পৌঁছেছেন অথচ সম্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁদের সম্বন্ধে জানতেন না এবং

১ এটি আমাদের তানপুরা নয়, একটি পারসীক বাদ্য। আগে এর নাম ছিল 'দুম্বা-বরাহ্‌'।

লেখকের সঙ্গেও সংযোগ ঘটেনি তাঁদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়নি।

রচনা যাতে স্ফীত না হয় সেই কারণে তাল সম্বন্ধে লেখা হয়নি। যাঁরা এ সম্বন্ধে জানতে চান তাঁরা প্রাচীন গ্রন্থ থেকে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারেন।

১০৭১ হিজরীতে লেখক যখন পবিত্র জন্মভূমিতে যাবার ইচ্ছা করেছিলেন, মন্ত্রিপদস্থ ব্যক্তিগণ তাঁর সম্বন্ধে অহিতকর আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন যাতে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের তাঁকে শত্রু বলে ধারণা হয়। বাদশা বিরক্ত হয়ে লেখকের প্রতি বিরুদ্ধভাবে রোষকটাক্ষ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। লেখক নির্জনবাস অবলম্বন করলেন। কিছুকাল পরে তিনি বাদশার আনুকূল্য প্রার্থনা করলেন কিন্তু হুকুম মিলল না। চাকুরীহীন অবস্থায় তিনি কষ্টে পড়লেন। লেখা ছেড়ে সিপাহীগিরি করতে হল। তিনি সির্‌হিন্দ্‌-এ নির্জনবাস করতে লাগলেন। তখন তিনি এই কবিতাটি স্মরণ করলেন। নজ্‌ম্—খিজির পথ দেখালেও সে পথে যেও না; নিজের বন্ধুর প্রদর্শিত পথে চল এবং কিছুমাত্র নালিশ কোরো না। মাথা ঘুরতে ঘুরতে জীবনই চলে যায় কিন্তু চাকার কল তার পথ থেকে সরে না।

সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়েই এই নিবন্ধ রচনার শুরু হল। সেই সব লেখা পূর্বেই প্রদর্শিত হয়েছে। কিছু নতুন বস্তুও লেখা হল। কিছু বাধা-বিপত্তিও ঘটল।

১০৭৩ হিজরীতে ফিরে যাবার হুকুম মিলল। লেখক তাড়াতাড়ি সম্রাটের[১] কাছে উপস্থিত হলেন। এই রচনা আর অগ্রসর হল না। ইতোমধ্যে সম্রাটের পতাকা কাশ্মীরের গুল্‌গস্তের[২] দিকে অগ্রসর হল। এটি একটি অতুলনীয় ঘটনা। এই সামান্য ভৃত্য এই বাহিনীর সঙ্গে সমস্ত কষ্ট সহ্য করে বিজয়াভিযানের শেষ পর্যন্ত ছিল। হুকুম হল এই অভিযান-কারীদের মধ্যে কয়েকজন প্রয়োজনের জন্য থাকবে এবং সম্রাটের সঙ্গে আরও কম লোক থাকবে। সম্রাটের কার্যনির্বাহের জন্য কেবলমাত্র লেখকের মত পরিচিত লোকেরাই রইলেন এবং বাহিনীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ দিবারাত্র প্রার্থনা করতে লাগলেন। কাশ্মীরের রাস্তাঘাট এবং প্রস্তরময় স্থান সম্বন্ধে এইরকম বলা হয়:—বয়েৎ—চুলের চেয়ে সরু হচ্ছে এর রাস্তা। পথিকের কাছে তা কেশের মতই প্রতীয়মান হয়।

১ ঔরঙ্গজীব ২ গিলগিট্

(রাহে বারীকুতর্ আজ মূয়ে চুনী। বরাইয়ে রাহে রওয়ান চুঁ মূয়ে বীনী।)

লেখককে বাধ্য হয়েই লাহোর ছেড়ে আগে থেকে কাশ্মীরে আসতে হল। প্রধানদের পতাকাসমূহ যখন অগ্রবর্তী ছুটি ঘাঁটিতে (মন্‌জিল্-ই-শহর্) পৌঁছাল তখন লেখক তাঁদের যথোচিত সম্বর্ধনা এবং সম্মান প্রদর্শন করলেন। লেখক রীতি অনুসারে সুসজ্জিত বাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য অগ্রসর হলেন। গণৎকারসমূহের কাছ থেকে পরের দিন তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবার শুভ মুহূর্তটি জেনে নিলেন। সেই শুভলগ্নে এই বিশ্বস্ত ভৃত্য সমাগত প্রভুদের প্রণতি জ্ঞাপন করল। পরের দিন কাশ্মীরের পথে সাধারণ ও বিশেষদের সঙ্গে সম্রাটের দর্শন (ঘুসুল্‌খানা)[1] কম হয়েছিল। বিজয়ী সৈন্যবাহিনী উপযুক্তভাবে শহরে প্রবেশ করল। সম্রাট সৈনিকদের সমাবেশে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের প্রশংসায় এই বয়েৎটি উচ্চারণ করলেন—দগ্ধপ্রাণীও কাশ্মীরে এলে প্রাণ পায়। যে পাখি কাবাবে রয়েছে সেও পাখা মেলে উড়ে যায়। (হর্‌সুখ্‌তা জানী কে ব-কাশ্মীর্ দর্ আয়েদ্। কে মুর্‌ঘ্ ও কাবাব্ অস্ত্ বা বাল্ ও পরায়েদ্॥)

শীতকালে যাতে হিন্দুস্তানে পৌঁছানো যায় এই রকম হুকুম দেওয়া হল। এই দীন ব্যক্তিকে এই স্থানের সুবেদার নিযুক্ত করা হল। আমার কিন্তু ইচ্ছা ছিল যাতে হুজুরের কৃপাদৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না থাকি।

বাহিনীর প্রতিটি দলের তাঁবু ছিল এবং তাতে প্রার্থনাদি অনুষ্ঠিত হত। বায়েজিদ্ ও জুনায়িদ্ও আমার বাদশার সেবা করতে পারলে কৃতার্থ বোধ করতেন। সম্রাট ধর্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকতেন। তিনি আটবার প্রার্থনা সম্পাদন করতেন। বোধহয় এমন একটি ঘণ্টাও যেত না যে তিনি প্রার্থনার আবৃত্তি থেকে নিরস্ত থাকতেন। তিনি সব সময় প্রার্থনা ও ধর্মে নিযুক্ত থাকতেন।

বয়েৎ—তাঁর মুকুটের উপর বিস্তৃত ছিল অনেকগুলি হাত। তাঁর সিংহাসন ছিল আইনে বাঁধা।

(বর্ তাজ ফিশান্দা আস্তিনূহা। বর্ তখ্‌ৎ কশীদা আজ আইনূহা॥)

ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি দেশের অবস্থার খবর নিয়ে থাকেন। তাঁর হাত

১ ঘুসুল্‌খানা অর্থে স্নানাগার বোঝায় কিন্তু মুঘল যুগের ইতিহাসে এটি সম্রাটের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কাজে ব্যস্ত থাকলে তাঁর প্রাণ বন্ধুদের প্রতি আসক্ত থাকে (দস্ত্ ব্-কার্ ও দিল্ বা ইয়ার্ অস্ত্)। রাজ্যের দায়িত্ব ও কর্তব্যাদি সত্ত্বেও বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে যখন তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন তখন থেকেই কুরান প্রশংসনীয় ভাবে মুখস্থ করেন। তাঁর অভিষেকের (জলুস্) বৎসর থেকে ১০৭৬ হিজরী (১৬৬৬) পর্যন্ত এসেছে। সম্রাট যখন ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে পৌঁছান তখনই কুরান সম্পূর্ণভাবে তাঁর স্মৃতিগত হয়েছে। পরবর্তীকালে সম্রাট এটি বিশেষভাবে অনুশীলন করেন। এই সময় কেউ এমন একজন ব্যক্তি খুঁজে পাবেন না যিনি একাধারে সম্ভ্রান্তবংশীয় সম্রাট হয়েও নিজেকে অন্তরালে রাখেন, অধর্মাচরণ থেকে বিরত থাকেন, মুসলমানত্ব বজায় রাখেন ও ধর্মপালন করেন। আমীরদের প্রতি তিনি অমায়িক ব্যবহার করেন।

বিদায়কালে সম্রাট অধীনস্থদের বিশেষ পরিচ্ছদ, অশ্ব, তদীয় সাজসরঞ্জাম এবং হস্তী উপহার দিলেন। সম্রাটের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণপূর্বক কাতরচিত্তে অশ্রুপ্রবাহিত নেত্রে কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন করে উক্ত দেশ শাসনে প্রবৃত্ত হলাম। শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিদের শান্তিপূর্ণ কাজ দেওয়া হল। আইন অনুসারে কঠিন কাজগুলি বণ্টন করা হল।

এর মধ্যে অন্য সব স্থানও বাদশার শাসনে আনবার সিদ্ধান্ত করা হল। সেই সব স্থানে আলেকজান্দারও যেতে সমর্থ হননি। সৈন্যগণ কয়েকটি স্থান মই লাগিয়ে পার হল; কয়েক স্থান পায়ে হেঁটে এবং উঁচু দড়ির সাহায্যে অতিক্রম করে তিব্বতে উপস্থিত হল। প্রতিদিন যুদ্ধ করে তারা একেবারে সরজমীনে এসে পৌঁছল। নদীর ঘূর্ণীজলও তাদের ধ্বংস করতে পারল না। ধর্মের প্রতিষ্ঠা স্থাপন ছাড়া তাদের আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। ভগবানের ইচ্ছায় সেই দেশ জয় করা হল। স্ত্রীপুরুষ মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হল। সিন্ধুনদের উপর (বর্ আব্-ই-নীলাব্) বিজয়ী সৈন্যদের তাঁবুর উচ্চ চূড়াগুলি ভয়ঙ্কর দেখাতে লাগল যেন সেই দিক থেকে জগতের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। এর তুলনা দেখা যায়নি। সেই নদী চওড়ায় দুই বন্দুকের গুলির দূরত্বের[1] মত এবং তা সর্বত্রই সুগভীর। এর মধ্যে মূল্যবান প্রস্তরের খনি পাওয়া যায়। এইখানে কাফিরদের গ্রাম ছিল। সৈন্যেরা এইস্থানে তাদের বিজয়ী অভিযান সমাপ্ত করতে চাইল। ভগবানের কৃপায় সৈন্যরা দড়ির সাহায্যে নদী অতিক্রম করল। ওই সকল স্থানে ইসলাম

১ বন্দুকের গুলি যতটা যায় ততটা দূরত্বের মাপ হিসাবে ব্যবহৃত হত।

প্রতিষ্ঠিত হল। পরাজিত লোকসমূহকে সম্মানিত পোশাক প্রদান করা হল। তারা সেই পোশাক পরে পবিত্র কলমা পাঠ করল। সকলে আবার একত্র হয়ে আগের মত জমা হল। প্রত্যাবর্তনের পথে কোহিয়ান্, ছকার্, ডুন্দু, তিজাল্, কাশিয়াল, পুন্চ্ ও ডুমিয়াল প্রভৃতির মত দানবাকৃতি জাতিদের পরাজিত করল। তারা সকলে বাদশাহের শাসনকে স্বীকার করল। বন্দুকধারী বাহিনীকে একত্র করা হল। ছোট তিব্বতের জমীদার মুরাদ্ খাঁ,—তস্খীর, গুল্গস্ত ও বর্শালের পথ দেখিয়ে এলেন। মুরাদ্ খাঁ দ্রুতগতিতে এইসব শত্রুবেষ্টিত অঞ্চলে এসে তাদের অধম এবং অকর্মণ্য অবস্থা থেকে পবিত্র করে তুললেন। তিনি এইসব স্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। বর্শালের হাকিম পালিয়ে গেলেন এবং কাশঘর্-এর রক্ষী আশ্রয় ভিক্ষা করলেন। এই দুটি দেশ এবং তস্খীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল।

শীতের দুই মাস বন্দোবস্তের জন্য কাশ্মীরের সুবেদার পুন্চ্-এ চলে এলেন। এইখান থেকে রাস্তাঘাট ভাল ছিল। বৃষ্টি এবং বরফের মধ্য দিয়ে কষ্টের সঙ্গে পরিচালিত অশ্বে (কুতল্) আরোহণ করে, সৌভাগ্যক্রমে পুলের উপর দিয়ে পার হয়ে রাজধানীতে পৌঁছে সকলে উৎসাহিত ও উৎফুল্ল হয়ে উঠল। পথের সীমান্তে এসে বরফ এবং বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া গেল।

অবসর গ্রহণের কালে বিশেষ অশ্ব ও সোনার সাজসরঞ্জাম এবং বিশেষ পরিচ্ছদ (খেলাৎ) উপহার পাওয়া গেল। কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন করে সবাইকার খুব আনন্দ হল, কেন না তখন বসন্ত সমাগত হয়েছে। এই বয়েৎটি কাশ্মীর ব্যতীত আর কোথাও প্রযোজ্য নয়।

আগর্ ফির্দৌস্ বর্ রুয়ে জমীন্ অস্ত্ ।
হমীন্ অস্ত্ ও হমীন্ অস্ত্, হমীন্ অস্ত্ ॥

মাটির উপরে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তবে সে এইখানে, সে এইখানে, সে এইখানে।

দেশের অবস্থা বুঝে নিতে, এলাকা ও সীমানা নির্দেশের বন্দোবস্ত করতে ছ মাস কেটে গেল। এই এলাকার দিকে চেয়েই কি লেখা হয়েছিল—

বয়েৎ-কৌতুকে ওরা সবাই বেহুঁস্ হয়ে চলেছে। আনন্দের বার্তা তাদের কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দিয়েছে।

নকে আজ্ জউক্ চুনান্ রফ্তার্ হোশ্ ।
কে কশান্দশ্ মঝ্হা দোশ ব্-দোশ্ ॥

একখণ্ড জমিতে কত রকমের, কত রঙের ফুল ফোটে। তাদের গন্ধে স্থানটি আমোদিত হয়। এমন স্থানের পরিচয় কোনও লোকেরই জানা নেই, কেউ দেখেও নি। কত লোক আরব, ইরাক, আরবীয় দেশ ব্যতীত অপর দেশ, খোরাসান, মাউরুন্নাহার্ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এখানে এসে বন্ধুভাবে বাস করেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে এমন পুষ্পিত স্থান তাঁরা দেখেননি এবং এরকম যে আছে তাও শোনেননি। এই বিশ্বাসেই তাঁরা বলেছেন যে স্বর্গ যদি আসমানে থাকে তবে সে এই স্থানেরই ঊর্ধ্বে অবস্থিত; আর যদি ভূমির উপরে থাকে তবে সে এইখানেই, আর যদি মাটির নীচে থাকে তবে সে এই মাটিরই নীচে।

বয়েৎ—বক্তার কথা ছিল রঙীন। আমার হাতে ছিল হেনার কলম।

আমার কলম সার্থক হবে যদি তা এই সৌন্দর্যের কিছুটাও ভাল করে প্রকাশ করতে পারে। যে কোহিস্তান্ পর্বতের উত্তুঙ্গতা এবং বিরাটত্বে মানুষের পা দুটো পৌঁছোতে পারে না লেখনী তার সৌন্দর্য বর্ণনায় সক্ষম হয়। সেই স্থানের ঝর্না (চশ্মায়ে সার্) অমৃতধারা (আব্-ই-হৈওয়ান্) বর্ষণ করে। কথিত আছে সেকেন্দার (আলেকজান্দার) স্বয়ং এই ঝর্নায় পৌঁছোতে চেষ্টা করেও সমর্থ হননি।

এবার আবার মূল বক্তব্যবিষয়ে ফিরে আসা যাক। সির্হিন্দ-এ থাকতে যা লেখা হয়েছিল তা লিখিতই ছিল। বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা কৌতুক হিসাবে সঙ্গীতচর্চা করে থাকেন তাঁদের কেউ কেউ এই লেখাটি নিয়ে নিলেন। কেউ কেউ বললেন লেখা সমাপ্ত হয়ে গেছে। কেউ লেখাটি নকল করে নিলেন। রচনা সম্পূর্ণ তথ্যসম্বলিত হয়ে সমাপ্ত হবার পূর্বেই এইসব ঘটল। ফকীর (লেখক) এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করছেন, কেন না দু-তিন সাল যাবৎ এই নিবন্ধটি নানা জায়গায় প্রায়ই দেখা গেছে। প্রয়োজনবোধে এবং ফুর্সতের অভাবে ধৈর্যহীন ব্যক্তিগণ এই অবস্থাতেই এটিকে অবলম্বন করেছেন।

নজ্ম্—আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে, মন বেদনায় পূর্ণ, মাথায় বহন করছি প্রেম। যারা প্রেমাসক্ত তারা অধৈর্যকে পরিহার করতে পারে না। প্রেমে পূর্ণ মজ্নুঁ হুনুহিতা লায়লীকে গ্রহণ করতে ত্বরান্বিত হয়েছিল।

১০৭৬ (১৬৬৬) হিজরী সনের শীতকালে এই রচনা সমাপ্ত হল। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না বাদশা খুৎবা পড়ে এই নিবন্ধের নাম ঘোষণা করছেন; যতক্ষণ পর্যন্ত না এই রচনা সম্রাট আলম্গীর্ আলম্বখ্শের কাছে পৌঁছোচ্ছে

এবং তিনি ভগবৎকৃপায় এটি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত করেছেন এবং তাঁর দৃষ্টি থেকে করুণাবারি নিঃসৃত হচ্ছে; যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বর্গীয় সভার মত সুমহৎ মজলিসে এটি গৃহীত হচ্ছে; যতক্ষণ পর্যন্ত না দীন দুনিয়ার বাদশা এটিকে উত্তম রচনা বলে স্বীকার করছেন; ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুবান্ধবদের কাছে এটি অসমাপ্ত বলেই গণ্য করা হবে এবং এটিকে দূরে রাখা হবে। যে সব বিচক্ষণ ব্যক্তিদের হাতে এটি পড়বে তাঁরাও যেন এটি সমাপ্ত হয়েছে বলে মন্‌জুর্ না করেন।[১]

কাশ্মীরে হিন্দুস্তানের সঙ্গীত আদৌ প্রচলিত নেই। মাঝে মাঝে চতুর বাদকগণ ফার্সী দেশোৎপন্ন সঙ্গীত বাজিয়ে থাকেন। ফকীর (লেখক) ফার্সী সঙ্গীত কিছুই বোঝেন না। তিনি ফার্সী মোকামসমূহের যেগুলি হিন্দী রাগসমূহের সদৃশ ছিল সেগুলির নাম অভিজ্ঞ গায়ক ও বাদকদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছেন। এ পর্যন্ত একাদশ প্রকার গীত জানা গেছে, যেগুলি হিন্দী গীতের অনুরূপ। এইগুলি লিপিবদ্ধ করা হল। এর পরে আর যা আছে সেগুলি অনুসন্ধান করে জেনে নিয়ে ভগবৎকৃপায় সম্ভব হলে লেখবার ইচ্ছা রইল।

যেসব হিন্দী গীত ফার্সী ধরনের অনুরূপ সেগুলির তালিকা দেওয়া হল:

১। ঘজাল এবং খট্ একই রকম।

২। মুখালিফ্ রামকলীর অনুরূপ।

৩। নাইরীজ্ কল্যাণের কাছাকাছি।

৪। আশীরান্ এবং বড়হংস খুব কাছাকাছি।

৫। দোগাহ্ এবং শুধ্ তোড়ী পরস্পরের কাছাকাছি।

৬। নওয়া এবং সারঙ্গ পরস্পরের খুব নিকট।

৭। রাস্ত্ নাট-এর কাছাকাছি।

৮। আর্‌বান ও পুরিয়া-ধনাশ্রী পরস্পরের বিশেষ কাছাকাছি।

৯। মুজাদাৎ ও বরুউয়াহ্-এর অন্তর্গত গীত গাওয়া হয়ে থাকে। বর্তমান ভাষায় একে বরোয়া (বারোঁয়া) বলা হয়। একে কেহ কেহ ঠুম্‌রী বলেন।

---

১ বস্তুতঃ এই গ্রন্থটি ঔরংজীব প্রকাশ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন কিনা সন্দেহ, কেন না এই সময় থেকে তিনি সঙ্গীতকে পরিহার করতে থাকেন এবং কিছুকালের মধ্যে সঙ্গীতকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন।

(বিল্‌ফেল্ জবান্-ই-রোজ্‌গার্ বেহ্ বরোয়া ও বাজে ঠুম্‌রী গুয়েন্দ্।)

১০। শাহ্‌নাজ্ শ্রীরাগের অনুরূপ।

১১। বর্তমানে মঘ্‌লুব্-এর মত একরকম সুর পাঞ্জাবে গাওয়া হয়। এটি বসন্ত্-এর নিকটবর্তী।

ইরাক্, খোরাসান্, মাওরুন্নাহার্ এবং হিন্দুস্তান থেকে যেসব সঙ্গীতবিদ্যায় অভিজ্ঞ গায়ক-বাদক জমা হয়েছেন তাঁদের মধ্যে জুল্‌ফিকার হান্, করাহ্ মান্, লুপুর, জুল্‌ফিকার খাঁ, শাহ্ আব্বাস্ সফাবী—এঁদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কেউ আমার চোখে পড়েনি।

এই নিবন্ধ উপলক্ষ্যে লেখক পাঠকবর্গের কাছে এই আশা পোষণ করেন যে চিরজীবন এই রচনা পাঠ করে তাঁরা আনন্দিত হবেন। এই রচনা ফাতিহার[১] মত তাঁদের মনে থাকবে।

বয়েৎ—একটি কথাও অগোপন রাখার মত উত্তম কাজ আর নেই। বিদ্যা সম্পর্কে বিস্মৃতি না ঘটার চেয়ে ভাল আর কিছু নেই।

এক সুখুন্ নিস্ত্ কে খামোশী
আজ্ আন্ বেহ্‌তর্ নিস্ত।
নিস্ত্ এল্‌ম্ কে ফরামোশী
আজ্ আন্ বেহ্‌তর্ নিস্ত্।

---

১ কুরানের প্রথম অধ্যায়।

তুহ্‌ফাতুল্‌ হিন্দ্‌

মীর্জা খাঁ

তুহ্‌ফাতুল্‌ হিন্দ্‌

(সঙ্গীতবিদ্যা—পঞ্চম অধ্যায়)

তুহ্‌ফাতুল্‌ হিন্দ্‌ গ্রন্থটি রচনা করেছেন মীর্জা খাঁ ইবুনে ফখরুদ্দীন মুহম্মদ। এই নামের অর্থ ভারতবর্ষের উপহার। গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের স্তুতিপূর্ণ উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত বাদশাজাদা আজম শা তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কেন না নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে এইরকম উল্লেখ আছে। আজম শা ব্রজভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে জাহান্দর শা এবং কুকুলতাশ খাঁর অনুরোধে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে লিখিত আছে। যাই হোক গ্রন্থখানি ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই রচিত হয়।

তুহ্‌ফাতুল্‌ হিন্দ্‌ গ্রন্থটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ভূমিকায় ব্রজভাষার বর্ণমালা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ছন্দ, গণ, মাত্রা প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তুক (কাফিয়া) সম্বন্ধীয় বর্ণনা আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে রস এবং অলঙ্কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শৃঙ্গার রস, নায়ক-নায়িকার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে রতিশাস্ত্র সম্পর্কীয় আলোচনা এবং সপ্তম অধ্যায়ে সামুদ্রিক শাস্ত্রের বর্ণনা আছে।

সঙ্গীত অধ্যায়টিই এই গ্রন্থের মুখ্য অধ্যায় বলে মনে হয়। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পারসীক সঙ্গীতের উল্লেখও গ্রন্থকার এই অধ্যায়ে করেছেন। এই গ্রন্থের পরিধি সুবিস্তৃত তথাপি এ কথা স্বীকার্য যে ফকীরুল্লাহ্‌র মত নিপুণ সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী এই গ্রন্থে কোথাও নেই।

সঙ্গীতাংশের প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় সঙ্গীতের স্রষ্টিকর্তা মহাদেব এবং তাঁর থেকে রাগ ও রাগিণী সমূহ উদ্ভূত হয়েছে। সোমেশ্বর নামের অর্থ মহাদেব। এই কারণে রাগ-রাগিণীর প্রথম মতকে সোমেশ্বর মত বা শিবমত নাম দেওয়া হয়েছে। এর পর ভরত মত প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর হনুমান মত স্থাপিত হয়। তার পর কল্লিনাথ মত প্রচলিত হয়েছে। এই চারটি মতই সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে[১]

---

১ ১৬৭৫ খ্রীঃ নাগাদ।

যে মতটি প্রচলিত তা হনুমান মত। এই চারটি মত যে সব গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে সেগুলি হচ্ছে—রাগার্ণব, সঙ্গীতদর্পণ, মানকুতূহল, রাগদর্পণ, সভাবিনোদ প্রভৃতি গ্রন্থ। গ্রন্থকার এই সব গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। সঙ্গীতশাস্ত্র সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম—স্বর অধ্যায়। দ্বিতীয়—রাগ অধ্যায়। রাগ, রাগিণী এবং পুত্রগুলি পারসীক সঙ্গীতের মোকাম, শুবা ও গোশার সঙ্গে তুলনীয়। তৃতীয়—তাল অধ্যায়। চতুর্থ—নৃত্য অধ্যায়। পঞ্চম—অর্থ অধ্যায়; অর্থাৎ উত্তম শব্দাদির প্রয়োগ। ষষ্ঠ—ভাব অধ্যায়; অর্থাৎ ভাবের প্রকাশ। নৃত্যকালেই এর প্রয়োগ হয়। সপ্তম—হস্ত অধ্যায়; এটি বাদ্য সম্পর্কিত। আলোচ্য সঙ্গীতাংশে কেবল স্বর, রাগ ও তাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সাতটি স্বর—

খরজ—একে স্বর বলা হয় কেন না এইটি প্রধান স্বর। এই "স্বর" থেকেই আর স্বরগুলি উৎপন্ন হয়েছে। অপর ছটি স্বর—

রেখাব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিখাদ।

অতঃপর বাইশটি শ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে এবং চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে। এর পর গ্রাম সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সর্বনিম্ন গ্রামের নাম খরজ গ্রাম, সর্বোচ্চ গ্রামের নাম গান্ধার গ্রাম। নিম্ন এবং উচ্চগ্রামের মাঝামাঝি গ্রামকে মধ্যমগ্রাম বলা হয়। গ্রামের পর সাতটি স্বর কি ভাবে উৎপন্ন হল সে বিষয়ে বলা হয়েছে। ময়ূরের ডাক থেকে সা; পাপিয়ার ডাক থেকে রে; পুংছাগের আওয়াজ থেকে গা; সারসের শব্দ থেকে মা; কোয়েলের আওয়াজ থেকে পা, ভেকের আওয়াজ থেকে ধা এবং হাতীর আওয়াজ থেকে নি নির্ণীত হয়েছে—এটি ভারতীয় সঙ্গীতে সুপরিচিত।

এর পর স্বরের স্থান সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এই তিনটি স্থানের প্রথমটির নাম মন্দ্র। এটি খরজ গ্রামস্থ স্বর সমূহ নির্দেশ করে। দ্বিতীয়টি মধ্য—খরজ থেকে মধ্যমগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। তৃতীয়টি তার—গান্ধার গ্রামে বিস্তৃত। এর পরে শ্রুতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। শ্রুতিকে মীর্জা খাঁ শোরৎ বলেছেন। এই গ্রন্থেও শাস্ত্রানুযায়ী বাইশটি শ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে; যথা—চতুঃশ্রুতিক খরজ, ত্রিশ্রুতিক রেখাব, দ্বিশ্রুতিক গান্ধার, চতুঃশ্রুতিক মধ্যম, চতুঃশ্রুতিক পঞ্চম, ত্রিশ্রুতিক ধৈবত এবং দ্বিশ্রুতিক নিখাদ। এর পরে একুশটি মূর্ছনার উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর রাগজাতির উল্লেখ করা হয়েছে। জাতি তিন প্রকার;

সম্পূরণ, খাড়ব (খাড়ো) এবং ঔড়ব (ওড়ো)। রাগ-রাগিণীর আরও তিনটি জাতির উল্লেখ মীর্জা খাঁ করেছেন—শুদ্ধ, সালঙ্ক এবং সঙ্কীর্ণ। শুদ্ধের একটি প্রকারভেদ হচ্ছে মহাশুদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণ পর্যায়ের মহাসঙ্কীর্ণ নামক আরও একটি প্রকারভেদেরও উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ে গায়কদের প্রকারভেদ এবং তাদের গুণ ও দোষের উল্লেখ করা হয়েছে। মীর্জা খাঁ পাঁচ প্রকার শিল্পীর উল্লেখ করেছেন—সহকার, আনুকার, রসিক, রঞ্জক ও ভাবুক। রাগদর্পণ গ্রন্থে এঁদের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে মীর্জা খাঁও সেই বর্ণনাই প্রদান করেছেন। এর পরে রাগদর্পণ অনুযায়ী উত্তম, মধ্যম, অধম, একল, যমল এবং বৃন্দের বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর মীর্জা খাঁ মৃষ্ট, মধুর, চেহাল, সুখাবহ, কোমল, শ্রাবক, করুণ, ঘন, স্নিগ্ধ, গাঢ়, শ্লক্ষ্ণ, প্রচুর, রক্তি, কণ্ঠের এই সব গুণগুলির উল্লেখ করেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ষোলো প্রকার গুণের নাম করেছেন যার জন্য শিল্পীরা উত্তম বলে বিবেচিত হন। এর পরে সাতটি দোষের উল্লেখ করা হয়েছে;—রুক্ষ, স্ফুটিত, নিঃসার, কাকোলী, কেটি, কৃশ এবং ভগ্ন। এগুলির ব্যাখ্যাও রাগদর্পণের অনুরূপ। এ ছাড়া সন্দষ্ট, উদ্‌ঘুষ্ট, ভীত প্রভৃতি পঁচিশ প্রকার গায়নদোষের যে উল্লেখ রাগদর্পণে করা হয়েছে এই গ্রন্থেও সেগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। এর পরে বৃন্দ সম্পর্কে উত্তম, মধ্যম এবং অধম—এই তিনটির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাও রাগদর্পণের অনুরূপ।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ভাগে গীতকার এবং বিবিধ গীতের উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণ বা কথার বিন্যাসকে বাণী বা মাৎ (মাতু) বলা হয়। গানকে ধাৎ (ধাতু) বলা হয়। যাঁরা বাণী এবং ধাতুতে উত্তম তাঁদের বাগগেয়কার বলা হয়। এ সম্বন্ধেও রাগদর্পণে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে; অতএব পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সঙ্গীতের প্রকারভেদ প্রসঙ্গে উক্ত মন্, ছন্দ, ধরু, দোহা প্রভৃতি সম্বন্ধেও নতুন কিছু বলা হয়নি। প্রবন্ধ সম্বন্ধে মীর্জা খাঁ বলছেন যে এর কয়েকটি প্রকারভেদ বর্তমান। যাঁরা প্রাচীন সঙ্গীতে অভিজ্ঞ তাঁরা এটি গেয়ে থাকেন। এটি প্রাকৃত ভাষায় গাওয়া হয়। আজকালকার ভাষায় একে বলে পাতালবাণী[১]। ব্রজভাষায় একে নাগবাণী বলা হয়।

---

১ মীর্জা খাঁ অপর অংশে তিনটি ভাষার উল্লেখ করেছেন। দেবতাদের ভাষাকে বলা হয়

দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবন্ধ হচ্ছে—ধ্রুপদ। এটি চারটি তুকে নিবদ্ধ। এই তুকগুলির নাম হচ্ছে—আস্থল (স্থায়ী)। একে পিড়াবন্দাও[২] বলা হয়। দ্বিতীয়টিকে অন্তরা বলে। পরের দুটি তুককে ভোগ বলা হয়; সাধারণ্যে এটি আভোগ নামে পরিচিত। কেউ কেউ চতুর্থ তুককে আভোগ বলেন। এই গীত ব্রজভাষায় প্রচলিত এবং গোয়ালিয়রের রাজা মান এটি রচনা করেন। ধ্রুপদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দুই তুকের ধ্রুপদকে তিউট বলেন। এর সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল উচ্চারণ করা হয়। এর একটি প্রকারভেদ—ফুলবন্দ্। আর এক প্রকারের নাম—যুগলবন্দ্। এতে দুজনে গান করে থাকেন। একজন গান করেন আর একজন তালের বোল প্রভৃতি উচ্চারণ করেন। রাগ ও রাগিণীর প্রকৃতি অনুসারে পর পর গাইলে তাকে রাগসাগর বলে। দীর্ঘ কবিতাযুক্ত একপ্রকার গানকে বিষেণপদ বলে। সুরদাস এই গীত রচনা করেন এবং চমৎকারভাবে গাইতেন। খিয়াল শব্দটি আরবী কিন্তু বর্তমানে হিন্দুস্তানে এর "খ" উচ্চারণটি আরবী রীতিতে করা হয় না; এটি সাধারণ খিয়াল-এ পরিবর্তিত হয়েছে। এই গীত দুটি তুক দ্বারা গঠিত। জৌনপুরের সুলতান হুসেন শর্কী এই গীতের প্রবর্তক। এটি বেশীরভাগ খয়রাবাদের ভাষায় রচিত। পাঞ্জাবে প্রচলিত গীতকে ডপা বলে। এক তুকের গীতকে চুৎকলা বলে। এর প্রকারভেদ বর্তমান। পূর্বীভাষায় দুই তুকে গঠিত হলে তাকে বলে পূর্বী। কওল ও তরানাকে বর্তমানে হিন্দুস্তানে তিলানা বলা হয়। এই জাতীয় গীতে আরবী ও ফার্সী পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সোরবন্ধ্ নামক প্রকারভেদে অর্থহীন এলা, এলালা, এলালুম, তানা, তন্, দেরেনা, দানী, তাদানী প্রভৃতি শব্দ সুর সহযোগে গাওয়া হয়। আমীর খুসরও এর প্রবর্তক। জকরী-নামক গীত কয়েকটি চরণে নিবদ্ধ। এই চরণগুলিকে পীরী বলা হয়। এটি ছন্দে আবদ্ধ নাও হতে পারে। বর্তমানে এটি গুজরাটে প্রচলিত। হাজী মুহম্মদ এর প্রবর্তক। কদকা নামক গীতও কয়েকটি চরণে নিবদ্ধ। এইগুলিকে কড়ী বলা হয়। এই কারণে এই গানের তুককেও কড়ী বলা হয়। এটি রাজপুতদের ভাষায় গান করা হয়। জোয়ানরা এটি যুদ্ধে গেয়ে থাকে। মথুরা, গোয়ালিয়র ও চিটুয়া অঞ্চলে

আকাশবাণী বা দেববাণী। পরাকীর্ত বা প্রাকৃত ভাষায় রাজা, মহারাজ প্রভৃতি প্রধানগণের স্তুতি রচনা করা হয়। পাতালবাণী বা নাগবাণী নিম্নতর বর্ণনায় প্রযোজ্য।

২ বাংলা আখড়াই গানে পিড়াবন্দার উল্লেখ আছে। একে পিড়েবন্দী বলা হয়েছে।

ব্রজভাষাতে সাদ্রা গাওয়া হয়। মীর্জা খাঁ বাদ বা বার নামক একপ্রকার গীতেরও উল্লেখ করেছেন।

আটটি হরফ ও চারটি গণ ওস্তাদ সম্প্রদায় মঙ্গলজনক বলে মনে করেন না। আটটি হরফ হচ্ছে—হ, জ, ঘ, ন, ধ, র, ষ এবং ভ। চারটি গণ হচ্ছে—জ-গণ, স-গণ, র-গণ, এবং ত-গণ।

এর পর সঙ্গীতে মতসমূহের প্রবর্তক এবং দেবগণের উল্লেখ করা হয়েছে।

মতের প্রবর্তক—সোমেশ্বর, ভরত, হনুমান বা হনুমন্ত। এতদ্ব্যতীত দেবগণের মধ্যে মীর্জা খাঁ কুড়িটি নামের উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে সবগুলি স্পষ্ট নয়। এর কয়েকটি হচ্ছে—পার্বতী, সরস্বতী, দুর্গা, বায়ু, নারদ, কশ্যপ, শার্দুল, কোহল, অশ্বতর, হাহা, হুহু, রাবণ, অর্জুন।

অতঃপর নায়ক প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। যাঁরা বর্তমান সঙ্গীতে অভিজ্ঞ, বাদ্য ও নৃত্য সম্বন্ধেও পরিজ্ঞাত এবং অপরকে শিক্ষা দিতে সমর্থ তাঁদের নায়ক বলা হয়। যাঁরা কেবল মার্গ এবং দেশী পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ তাঁদের গান্ধর্ব বলা হয়। যাঁরা কেবল দেশী-রাগাদিতে পারদর্শী কিন্তু মার্গ সম্বন্ধে অবহিত নন তাঁদের আন্কার বলা হয়। এঁদের গুণীও বলা হয়ে থাকে। গান্ধর্ব এবং গুণকার যদি তিউট গানে অভিজ্ঞ হন তা হলে তাঁদের বর্তমানে কলাবন্ত বলা হয়। যাঁরা বর্তমানে কওল, তরানা এবং খিয়ালে অভিজ্ঞ তাঁদের ঢাড়ী বলা হয়। যাঁরা কেবলমাত্র সঙ্গীতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ কিন্তু প্রযুক্ত গীতে দক্ষ নন তাঁদের পণ্ডিত বলা হয়ে থাকে।

বিখ্যাত গায়কদের মধ্যে গোপালের নাম সর্বপ্রথম। এই সময় বাদশা আলাউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমীর খুসরও দহ্লবী শেখ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার শিষ্য ছিলেন। যখন নায়ক গোপাল দক্ষিণদেশ থেকে এসে সুলতান আলাউদ্দীনের কাছে সঙ্গীতবিদ্যার পরিচয় দিলেন এবং হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ্ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইলেন তখন সুলতান আলাউদ্দীন হিন্দুস্তানের কেউ গোপালের সম্মুখীন হোন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমীর খুসরও সুলতানের সিংহাসনের তলায় বসে থেকে গোপালের গান শুনলেন এবং সেগুলি মূলানুগভাবে গেয়ে শোনালেন। তিনি কওল ও তরানার প্রতিষ্ঠা করলেন। নায়ক গোপাল এ সব শুনে আশ্চর্য হলেন এবং নিরাশ হয়ে পড়লেন। অতঃপর বাচ্চুর নাম করা হয়েছে। ভাহু, পান্দুয়ী, বখশু এবং লোহঙ্গ—এই চারজন নায়ক ছিলেন। এঁরা গোয়ালিয়রের

রাজা মানের সমসাময়িক এবং সুপণ্ডিত ছিলেন। চার্জু, ভগবান, ধুন্ধী এবং দালু—এই চারজন পরবর্তীকালের নায়ক।

দ্বিতীয় পর্যায়ে গন্ধর্ব ও গুণকারদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আকবরের রাজত্বে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন তানসেন গুবরহার। ইনি পূর্বে রাজা রামের[১] আশ্রয়ে ছিলেন। বিশেষ সম্মান-সহকারে আকবর তাঁকে নিয়ে আসেন। তিনি গোয়ালিয়রের শেখ মুহম্মদ ঘাউসের স্নেহধন্য (মঞ্জুর-ই-নজর) ছিলেন এবং শেখের কবরের পরিধিতেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। দ্বিতীয়—সুজান খাঁ নওহার। ধ্রুপদী ছিলেন। মদিনায় এঁর মৃত্যু হয়। তৃতীয়—সুরগিয়ান খাঁ ও ফতেপুরী। চতুর্থ—চান্দ্ খাঁ। পঞ্চম—সুরয্ খাঁ। এঁরা দুই ভাই ছিলেন এবং নিজেদের গানে রবি ও শশী এই ভণিতা (তাখাল্লুস) ব্যবহার করতেন। ষষ্ঠ—তানতরঙ্গ খাঁ—মিয়া তানসেনের পুত্র। সপ্তম—মদন রায়। অষ্টম—রামদাস মুন্দী। নবম—বাজবাহাদুর। দশম—মিয়া চান্দু। একাদশ—মিয়া দাউদ। দ্বাদশ—মুল্লা ইশাক। ত্রয়োদশ—শেখ খিজির। চতুর্দশ—শেখ পঞ্চু। পঞ্চদশ—হুসন খাঁ পটনী। ষোড়শ—সুরত সেন। সপ্তদশ—আলা, লাউচী (লিপিকারের প্রমাদ ; লালা এবং দেবী হবে।) অষ্টাদশ—মীর্জা আকল।

তৃতীয় অধ্যায়

রাগ, রাগিণী, পুত্র, ভার্যা, ঋতু, কাল, পরিচ্ছদ, অলঙ্করণ, হনুমানমত থেকে আরম্ভ করে রাগ-রাগিণীর প্রতিষ্ঠা—প্রভৃতি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রাগের প্রকৃতি মোকাম-এর মত। এগুলি গানে প্রযুক্ত হয়। রাগ ছটি এবং এর প্রত্যেকটির পাঁচটি করে রাগিণী এবং ছটি পুত্র আছে। মতান্তরে প্রত্যেক রাগের ছটি রাগিণী ও ছটি করে পুত্র স্বীকৃত হয়েছে। রাগ পুংবাচক এবং রাগিণী স্ত্রীবাচক এবং পুত্র সন্তানবাচক। ভার্যা শব্দে পুত্রবধূ বোঝায়।

প্রথমে ক্রিয়ার উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রত্যেক রাগ-রাগিণী তিনরকম—ওড়ো (ঔড়ব), খাড়ো (খাড়ব) এবং সম্পূরণ (সম্পূর্ণ)।

পঞ্চস্বরযুক্ত হলে ওড়ো, সপ্তস্বরযুক্ত হলে সম্পূরণ এবং ছটি স্বরযুক্ত হলে

---

১ ভট্টদেশীয় রাজা রামচাঁদ প্রতাপশীলতা এবং বদান্যতার জন্য বিখ্যাত। আকবর তাঁর রাজত্বের সপ্তম বৎসরে এঁর আশ্রয় থেকে তানসেনকে দরবারে নিয়ে আসেন।

খাড়ো হবে। দ্বিতীয় ষড়ঋতু। বর্তমানে হিন্দুস্তানে বারো মাসে বৎসর গণনা করা হয়। দুই মাসে এক ঋতু। এইরকম ষড়ঋতু বর্তমান।

ওস্তাদগণ ছটি রাগের নির্দেশ করেছেন। এরা ভার্যা ও পুত্রসহ অবস্থান করে। ঋতু অনুসারে এগুলি গাওয়া হয়। প্রথমে বসন্তঋতু। একে মধুঋতুও বলা হয়। চৈত্র ও বৈশাখে বসন্তকাল। ফার্সীতে এই দুটি মাস হচ্ছে—ইস্ফান্দারমুজাহ্ ও ফরোয়ার্দিন্। এই ঋতু হিন্দুস্তানের বহার। দ্বিতীয় গ্রীষ্মঋতু—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে সম্পূর্ণ। ফার্সীতে এই দুটি মাস—উর্দী বিহিশৎ এবং খুর্দাদ্। তৃতীয় বর্ষাঋতু—শ্রাবণ, ভাদ্র এই দুই মাস। ফার্সীতে তীর ও মুর্দাদ্। চতুর্থ শরৎঋতু—কওয়ার (?) ও কার্তিক এই দুই মাস। ফার্সীতে শহরীওআর্ এবং মিহির্। পঞ্চম হিমঋতু—অগ্রহায়ণ, পৌষ এই দুই মাস। ফার্সীতে আবান্ ও আজর্ ; ষষ্ঠ শিশির ঋতু—মাঘ (এর উল্লেখ পুঁথিতে নেই) ও ফাল্গুন। ফার্সীতে দই ও বহমন্।

হনুমান মত অনুসারে ছটি রাগ—

ভৈরোঁ—এটি মহাদেবের মুখ থেকে নির্গত হয়েছে। ঔড়ব জাতি। ধা, নি, সা, গা, মা—এই স্বরগুলি ব্যবহৃত হয়। গ্রহস্বর ধৈবত। শরৎকালে প্রভাতে গেয়। রাগমালা অনুসারে এর আকৃতির বর্ণনা—

মহাদেবের মত শরীর। আকৃতি মনোরম। সিংহাসনে উপবিষ্ট। শরীরে ভস্মাবলেপন। শিরে জটা এবং জটায় গঙ্গা প্রবাহিতা। হাতে কঙ্কন। ললাটে নবোদিত চন্দ্র। দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে তৃতীয় নেত্র। স্কন্ধদেশে একটি সর্প বেষ্টন করে আছে। ললাটে তিলক। স্কন্ধে গজচর্ম নিক্ষিপ্ত। বিস্তৃত গজচর্মের উপর উপবিষ্ট। মুণ্ডমালায় সজ্জিত এবং গলদেশে মাল্য ধারণ করে আছে। হাতে ত্রিশূল। বৃষের উপর অধিষ্ঠিত।

মালকোশ—মহাদেবের কণ্ঠ থেকে উৎপন্ন। জাতি সম্পূর্ণ। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—এই সাতটি স্বরই ব্যবহৃত হয়। ষড়্জ গ্রহস্বর। শিশির ঋতুতে শেষরাত্রে গেয়। রাগমালা অনুসারে বর্ণনা—

লোহিত, শ্বেত বা নীল বাস পরিহিত পুরুষ। শক্তিমান ভয়ঙ্কর আকৃতি। হাতেযষ্টি। মদ্যপানে উদ্ধত। যৌবনভাবে উন্মত্ত। রমণীগণের সঙ্গে ক্রীড়ায় আসক্ত। গ্রীবাদেশে সুদীর্ঘ শত্রুমুণ্ডের মালা এবং বৃহৎ মোতির মালাও লম্বমান।

হিন্দোল—মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট। কেহ কেহ বলেন মহাদেবের নাভি থেকে এই রাগের উৎপত্তি। জাতি ঔড়ব। সা, গা মা, পা, নি—এই

স্বরগুলি ব্যবহৃত হয়। ষড়্‌জ গ্রহস্বর। বসন্তকালে দিবসের প্রথম যামে গেয়। রাগমালা অনুসারে বর্ণনা—

অল্পবয়সী সুন্দর তরুণ। জরির পোশাকে সজ্জিত হয়ে সোনার দোলনায় উপবিষ্ট। দোলনকালে সুন্দরীদের সঙ্গে মনোরম আলাপ ও গীতবাদ্যে রত এবং ধীরে ধীরে আমোদ আহ্লাদে মশগুল হয়ে পড়ছে।

দীপক—সূর্যের চক্ষু থেকে উৎপন্ন। জাতি সম্পূর্ণ। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—সবগুলিই প্রযুক্ত হয়। ষড়্‌জ গ্রহস্বর। গ্রীষ্মঋতুতে দিবসের মধ্যভাগে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

লোহিতকান্তি পুরুষ। সিন্দুরের মত লাল পোশাক। গলায় বৃহৎ মোতির মালা। মদমত্ত হস্তীর উপর উপবিষ্ট। বহু স্ত্রীলোক তাকে সাহচর্য প্রদান করছে। মতান্তরে, লজ্জাবশতঃ নির্বাপিতদীপ অন্ধকার গৃহে স্ত্রীসহবাসে রত।

শ্রী—মহাদেবের নাভি থেকে উৎপন্ন। জাতি সম্পূর্ণ। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—সব স্বর লাগে। ষড়্‌জ গ্রহস্বর। হিমঋতুতে দিবসের শেষভাগে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

শ্বেতবস্ত্র মতান্তরে লোহিত বস্ত্র পরিহিত। স্ফটিক ও মূল্যবান প্রস্তরের মালা গলদেশে বিস্তীর্ণ। হাতে পদ্মফুল (গুল্-ই-কমল)। বিচিত্রিত সিংহাসনে উপবিষ্ট। সম্মুখে গায়কগণ গীতানুষ্ঠানে রত।

মেঘ—আকাশ থেকে উৎপন্ন। জাতি ঔড়ব। ধা, নি, সা, রে, গা—এই পাঁচটি স্বর লাগে। ধৈবত গ্রহস্বর। বর্ষাঋতুতে শেষ রাত্রে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

শ্যামবর্ণ পুরুষ। মাথার কেশসমূহ একত্র করে মাথার উপরে বাঁধা। হাতে তরবারি।

অতঃপর রাগিণীগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

রাগ ভৈরোঁ'র পাঁচটি রাগিণী।

ভৈরবী—জাতি সম্পূর্ণ। মধ্যম গ্রহস্বর। শরৎঋতুতে প্রাতঃকালে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

সুন্দরী তরুণী। চক্ষু ও মুখ হর্ষোজ্জ্বল। কেশ স্বর্ণাভ। বর্ণ কমলালেবুর মত। অঙ্গে লোহিত বসন এবং শুভ্র শাড়ী। গলায় চাঁপাফুলের মালা। পর্বতচূড়ায় যেখানে লোহিত পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়ে আছে সেইখানে মহাদেবের পূজায় রতা। মঞ্জিরা (মন্দিরা?) বাজিয়ে গান করছে।

বীরারী—জাতি সম্পূর্ণ। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—সাত স্বরই লাগে। ষড়্‌জ গ্রহস্বর। শরৎকালে দিবাশেষে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

সুমুখী স্ত্রীলোক। কৃষ্ণকুন্তলা। হাতে কঙ্কন। কানে কল্পবৃক্ষের কুসুম (গুল্-ই-কল্প)। শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা। নায়কের সঙ্গে ক্রীড়া এবং আলিঙ্গনে রতা। মতান্তরে, নায়ককে ব্যজন করছে।

মধ্‌মাধ্—জাতি সম্পূর্ণ। মা, পা, ধা, নি, সা, রে, গা—এই সাতটি স্বর লাগে। মধ্যম গ্রহস্বর। শরৎকালে প্রাতঃকালে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

সুন্দরী। লোহিত কাঞ্চনবর্ণা। পীতবর্ণ পোশাকে সজ্জিতা। দেহে জাফ্রানী রঙের অবলেপন। নায়কের সহিত চুম্বন ও আলিঙ্গনে রতা।

সিন্ধুবী—জাতি সম্পূর্ণ। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি,—সাতটি স্বর লাগে। ষড়্‌জ গ্রহস্বর। শরৎকালে দিবাশেষে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

সুন্দরী। লোহিত বস্ত্র পরিহিতা। হাতে ত্রিশূল। কানে দ্বিপ্রহরে প্রস্ফুটিত ফুল। নায়কের জন্য দিবারাত্রি অপেক্ষমানা থাকার পর সে না আসাতে মহাদেবের পূজা করছে।

বঙ্গাল—জাতি সম্পূর্ণ। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—সাতটি স্বর লাগে। ষড়্‌জ গ্রহস্বর। শরৎকালে দিবাশেষে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

সুন্দরী। যোগিণীর বেশ। মুখে ভস্মাবলেপন। শিরে জটা। বামহাতে যষ্টি ও ত্রিশূল। ডানহাতে লোহিত পুষ্প। জাফরানী রঙের শাড়ী পরিহিতা। চন্দনের বিন্দুতে শোভমানা। ললাটে কস্তুরীর আলেপন।

রাগ মালকোশের রাগিণী।

টোড়ী—জাতি সম্পূর্ণ। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—সাতটি স্বর লাগে। ষড়্‌জ গ্রহস্বর। শিশির ঋতুতে দিবসের প্রথম প্রহরের পরে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

শ্বেতাঙ্গী। পরিধানে সাদা শাড়ী। কপালে চন্দনের অর্ধচন্দ্রাকৃতি তিলক (খাউর)। অঙ্গে কর্পূর ও জাফরানের সুবাস। বীণবাদনরতা। মরুদেশে দণ্ডায়মানা। হরিণসমূহ আনন্দের আধিক্যে ধীরতা অবলম্বন করেছে এবং সঙ্গীতে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। তারা স্ত্রীলোকটির সম্মুখভাগে গ্রীবাদেশ ন্যস্ত করে আছে।

গৌরী—জাতি ঔড়ব। সা, গা, মা, ধা, নি—এই পাঁচটি স্বর লাগে। যড়্‌জ গ্রহস্বর। শিশির ঋতুতে দিবাশেষে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

নবযুবতী। কৃশতনু। শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা। কর্ণে ভূষণ এবং কর্ণের উপর প্রস্ফুটিত আম্রকলি প্রদান করেছে। সুরাপানে বিহ্বলা। সুমিষ্টস্বরে বিহ্বলভাবে গান করছে।

গুণকরী, একে গুণকলীও বলা হয়। জাতি ঔড়ব। নি, সা, গা, মা, পা, —এই পাঁচটি স্বর লাগে। নিখাদ গ্রহস্বর। শরৎকালে প্রভাতে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

নায়কের বিচ্ছেদদুঃখে কৃশ ও দুর্বল। ক্রন্দন করছে। কেশরাশি বিপর্যস্ত। দুশ্চিন্তায় "আঃ" বলে কাতরধ্বনি করছে। কদমগাছের তলায় অবনত মস্তকে উপবিষ্টা।

খম্বাবতী—জাতি খাড়ব। ধা, নি, সা, রে, গা, মা—এই ছটি স্বর লাগে। ধৈবত গ্রহস্বর। শিশির ঋতুতে দিবা দ্বিপ্রহরের পরে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

সুন্দরী। আনন্দে ও খুশীতে সমুজ্জ্বল। রাত্রিদিন সঙ্গীত ও নৃত্যের আমোদে মশগুল। অঙ্গে সবুজ পোশাক এবং লাল শাড়ী। বিশেষভাবে ভূষিতা ও সজ্জিতা। ললাটে বিন্দু (চন্দনের) অঙ্কিত।

ককভ্—জাতি সম্পূর্ণ। ধা, নি, সা, রে, গা, মা, পা—এই সাতটি স্বর লাগে। ধৈবত গ্রহস্বর। শিশির ঋতুতে শেষরাত্রে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

সুন্দরী, সুপুষ্টা এবং সুনেত্রা। নায়কের সঙ্গে সহবাসে রতা। শরীরে এবং ভাবভঙ্গীতে গতরাত্রের সহবাস চিহ্ন পরিস্ফুট। অঙ্গের স্থানে স্থানে ক্ষতচিহ্ন বর্তমান। পরিধানে যে চাঁপাফুলের মালা ছিল তা ছড়িয়ে পড়ে আছে। রাত্রিজাগরণ ও পানাধিক্যবশতঃ চক্ষু রক্তবর্ণ এবং সম্যক্ উন্মিলিত হচ্ছে না। ঘর্মাক্ত কলেবরে রসালাপে প্রবৃত্তা।

রাগ হিন্দোলের রাগিণী।

রামকরী। একে রামকলীও বলা হয়। জাতি ঔড়ব। সা, গা, মা, পা এবং নি—এই পাঁচটি স্বর লাগে। যড়জ গ্রহস্বর। বসন্ত ঋতুতে প্রভাতে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

সুন্দরী স্বর্ণবর্ণা। নীল পরিচ্ছদ পরিহিতা। মণি, মাণিক্য ও স্বর্ণে

ভূষিতা। কপালে চন্দনের ফোঁটা। নায়কের প্রতীক্ষায় উপবিষ্টা। নায়ক অপর স্থানে রাত্রি অতিবাহিত করে এসে নানা ওজর দেখালেও অভিমান বশতঃ নিরুত্তর রয়েছে।

দেশাখ—জাতি খাড়ব। গা, মা, পা, ধা, নি, সা—এই ছটি স্বর লাগে। গান্ধার গ্রহস্বর। বসন্ত ঋতুতে দিবসের প্রথমভাগে গেয়। কোনও কোনও রাগমালা সম্বন্ধীয় গ্রন্থে এই রকম রূপবর্ণনা দেওয়া আছে—

সুন্দরী। মুখমণ্ডল ক্রুদ্ধ। কেশ আলুলায়িত। করে উদ্যত কৃপাণ। মল্লদের মত বাহুতে ও বক্ষদেশে মর্দিত মৃত্তিকার অবলেপন। সে শত্রুদের পরাজিত করে নায়ককে রক্ষা করছে।

রাগমালাগুলিতে কিন্তু মল্লের মত আকৃতিই অঙ্কিত আছে এবং মল্লপ্রক্রিয়া যথা সন্তরণ, প্রস্তরউত্তোলন প্রভৃতি কার্যে রত অবস্থাই দেখা যায়।

ললিত—জাতি ঔড়ব। ধা, নি, সা, গা, মা—এই পাঁচটি স্বর লাগে। ধৈবত গ্রহস্বর। বসন্ত ঋতুতে প্রভাতে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

সুন্দরী, কৃশা, রৌপ্যবর্ণা এবং হর্ষোজ্জ্বলতনু। মণিমাণিক্যে ভূষিতা। লোহিত পরিচ্ছদ, অলঙ্কারে সজ্জিতা এবং গলায় মাল্যশোভিতা।

বরাওর। বরাওলী, বিলাওল এবং বিলাওলীও বলা হয়। জাতি সম্পূর্ণ। ধা, নি, সা, রে, গা, মা, পা—এই সাতটি স্বর লাগে। ধৈবত গ্রহস্বর। বসন্তকালের দিবসের প্রথমভাগে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

কৃষ্ণাঙ্গী, কৃশতনু সুন্দরী। রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিহিতা। সপ্তভূষণে সজ্জিতা। নির্দিষ্ট স্থানে নায়কের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় উপবিষ্টা।

পটমঞ্জরী—জাতি সম্পূর্ণ। পা, ধা, নি, সা, রে, গা, মা—এই সাতটি স্বর লাগে। পঞ্চম গ্রহস্বর। বসন্ত ঋতুতে মধ্যরাত্রে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

বিয়োগিনী। নায়কের বিরহে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেছে। অস্থিরভাবাপন্না। বিষাদময় গৃহে উপবিষ্টা। তনু ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়েছে। গলায় হার ঝুলছে কিন্তু সেটি শুকিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে।

দেশী—জাতি খাড়ব। রে, গা, মা, ধা, নি, সা—এই ছটি স্বর লাগে। রেখাব গ্রহস্বর। গ্রীষ্মঋতুতে দিবসের দ্বিতীয় প্রহরে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

সুন্দরী। সবুজ পরিচ্ছদ পরিহিতা। স্বর্ণ, রৌপ্য ও রত্নালঙ্কারে ভূষিতা।

যৌবনোচিত চাঞ্চল্য ও কামনায় শয়নাগারে নায়কের সঙ্গে সহবাস প্রার্থনা করছে।

কামোদ—জাতি সম্পূর্ণ। ধা, নি, সা, রে, গা, মা, পা—এই সাতটি স্বর লাগে। ধৈবত গ্রহস্বর। গ্রীষ্মঋতুতে দিবসের দ্বিতীয় প্রহরে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

সুন্দরী। হরিদ্রাভ শ্বেতকান্তি। পরিধানে লাল শাড়ী। দুশ্চিন্তার অগ্নিতে দগ্ধা। যৌবনের কামনায় দুর্বলা, ভীতা এবং ক্রন্দনরতা। প্রেমাক্লিষ্ট অবস্থায় প্রান্তরে নায়কের প্রতীক্ষায় উপবিষ্টা।

নট—জাতি সম্পূর্ণ। সা, নি, ধা, পা, মা, গা, রে—এই সাতটি স্বর লাগে। ষড়জ গ্রহস্বর। গ্রীষ্মঋতুতে দিবাশেষে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

লোহিতবর্ণা তরুণী। স্বর্ণ ও রত্নভূষণে অলঙ্কৃতা। অশ্বের উপর উপবিষ্টা। পরিধানে পুরুষের পরিচ্ছদ। উন্মুক্ত তরবারি হস্তে যুদ্ধস্থলে শত্রুকে আঘাত করছে।

কেদারা—জাতি ঔড়ব। নি, সা, গা, মা, পা—এই পাঁচটি স্বর লাগে। নিখাদ গ্রহস্বর। গ্রীষ্মঋতুতে মধ্যরাত্রে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

যোগিনী। শিরে জটা। বেশও যোগিনীর মত অর্থাৎ গৈরিক (সুর্খ্ নিম্ রঙ্) বসন পরিহিতা। একটি নাগ শিরোদেশ বেষ্টন করে আছে। জটায় গঙ্গা প্রবাহিতা। ললাটে অর্ধচন্দ্র। মুদ্রিতনেত্রে মহাদেবের ধ্যানে নিমগ্না।

কান্‌হরা (কানাড়া)—সংস্কৃত ভাষায় কর্ণাটী বলা হয়। জাতি সম্পূর্ণ। নি, সা, রে, গা, মা, পা, ধা—এই সাতটি স্বর লাগে। নিখাদ গ্রহস্বর। গ্রীষ্মঋতুতে রাত্রির প্রথম প্রহরে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

পুরুষের আকৃতি। পরিধানে শুভ্র পরিচ্ছদ। অঙ্গে কর্পূরের অবলেপন। দক্ষিণহাতে উন্মুক্ত তরবারি এবং বামহাতে গজদন্ত। সম্মুখে ভৃত্যগণ সম্মতির অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। স্ত্রীগণ স্তুতিভাষণে রতা।

শ্রীরাগের রাগিণী।

মালশ্রী—জাতি সম্পূর্ণ। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—এই সাতটি স্বর লাগে। ষড়্‌জ গ্রহস্বর। হিমঋতুতে দিবসের দ্বিপ্রহরে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

লোহিতকান্তি স্ত্রীলোক। কৃশতনু। পরিধানে হরিদ্রাবর্ণ পরিচ্ছদ।

পরিভ্রমণে এবং আমোদ উপভোগে রতা। নায়কের কাছ থেকে সরে এসে আম্রবৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট হয়ে অপর স্ত্রীগণের সঙ্গে হাস্যে নিমগ্না।

মারোয়া—জাতি খাড়ব। সা, পা, গা, মা, ধা, নি—এই ছটি স্বর লাগে। ষড়্‌জ গ্রহস্বর। হিমঋতুতে দিবার শেষ প্রহরে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা এবং সুবর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিতা। গলায় ফুলহার লম্বমান। নায়কের সঙ্গে মিলনের জন্য সঙ্কেতস্থানে উপবিষ্টা। মুখে অপরিচিত পরিবেশের উদ্বেগ।

ধনাশ্রী—জাতি খাড়ব। সা, পা, ধা, নি, রে, গা—এই ছটি স্বর লাগে। ষড়্‌জ গ্রহস্বর। হিমঋতুতে দিবসের দ্বিতীয় প্রহরে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

যোগিনীর রূপ। পরিধানে লোহিত পরিচ্ছদ। প্রিয়বিচ্ছেদে কৃশতনু। মূলশ্রী (?) বৃক্ষের তলায় বসে আছে।

বসন্ত—জাতি সম্পূর্ণ। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—এই সাতটি স্বর লাগে। ষড়্‌জ গ্রহস্বর। বসন্ত ঋতুতে দিবসের মধ্যভাগে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

পুরুষের বেশ। সুন্দর আকৃতি। বর্ণ সবুজ। পরিধানে লোহিত পরিচ্ছদ। মুকুটে ময়ূরপুচ্ছ। হাতে প্রস্ফুটিত আম্রপুষ্প। যৌবনমদে মত্ত। গলায় হার দুলছে। পুষ্পোদ্যানের প্রাঙ্গণে স্ত্রীদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদে রত। বাম হাতে তাম্বুল ধরে আছে। অপর স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ক্রীড়া ও হাস্য করছে এবং বাঁশি বাজাচ্ছে।

রাগমালায় অন্য রূপও বর্ণিত হয়েছে।

মেঘরাগের রাগিণী।

টঙ্ক—জাতি সম্পূর্ণ। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—এই সাতটি স্বর লাগে। ষড়জ গ্রহস্বর। বর্ষা ঋতুতে অর্ধরাত্রে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

যোগিনীর মত স্ত্রীলোক অর্থাৎ বিরহিনী। বিচ্ছেদজনিত দুশ্চিন্তায় আকুল হয়ে কমলপত্রের শয্যায় শুয়ে আছে।

মল্লার—জাতি ঔড়ব। ধা, নি, রে, গা, মা—এই পাঁচটি স্বর লাগে। ধৈবত গ্রহস্বর। বর্ষাঋতুতে অর্ধরাত্রে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

তরুণী। নায়কের বিরহে কৃশা। যুঁইফুলের অলঙ্কারে শোভিতা। কাঁদছে এবং কুঞ্জে বীণা বাজিয়ে নায়ককে স্মরণ করছে।

গুজরী—জাতি সম্পূর্ণ। রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা—এই সাতটি স্বর লাগে। ঋষভ গ্রহস্বর। বর্ষাঋতুতে দিবসের প্রথমভাগে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

চম্পকবর্ণা ক্ষীণমধ্যা স্ত্রীলোক। সুমিষ্টস্বরে গান করছে। পরিধানে পীতবাস এবং লাল শাড়ী। সপ্তভূষণে সজ্জিতা।

ভূপালী—জাতি সম্পূর্ণ। সা, নি, ধা, পা, মা, গা, রে—এই সাতটি স্বর লাগে; ষড়্জ গ্রহস্বর। বর্ষাঋতুতে রাত্রির প্রথমভাগে গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

সুন্দরী স্ত্রীলোক। পরিধানে শ্বেত শাড়ী। অঙ্গে কর্পূরের অবলেপন। গলায় হার। আরাম উপভোগ করছে। সমস্ত অঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার। হস্তদ্বারা নায়কের কণ্ঠ বেষ্টন করে একত্র বসে আছে।

দেশকার—জাতি সম্পূর্ণ। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—এই সাতটি স্বর লাগে। ষড়্জ গ্রহস্বর। বর্ষাঋতুতে শেষ রাত্রি গেয়। রাগমালা অনুসারে রূপবর্ণনা—

সুন্দরী শুভ্রা স্ত্রীলোক। মুখে ছোট তিল। চক্ষুর রঙ বাদামী (পিঙ্গলাক্ষী)। স্ফীতবক্ষা। পুষ্ট তনু। গলায় মুক্তার মালা। অঙ্গে সিন্দুর ও কর্পূরের অবলেপন। স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা নায়কের সঙ্গে একত্রে বসে ক্রীড়ায় রতা।

রাগসমূহের ছটি করে পুত্র আছে। তার বেশিও স্বীকৃত হয়।

ভৈরোঁ রাগের পুত্র—হরকিয়া (?), তিলক, পুরিয়া, মাধু, সুহর (?), বলবন্ত (?), মধ্।

মালকোশের পুত্র—মারু, মেওয়ার, বড়হংস, প্রবল, নন্দ, পূরণ, খুখর্। কেহ কেহ এর পরিবর্তে "মশ্তাঙ্গ" (Mushtung) লিখেছেন।

হিন্দোলের পুত্র—চন্দ্রবসন্ত, মঙ্গল, সুহা, বেণু, প্রধন. গৌরা, বিভাস। বিভাসকে ভাস্করও বলা হয়।

দীপকের পুত্র—কুন্তল, কমল, কুলঙ্গ, চুনিকা, কুম্ভ, রাম, মহল, হিমাল।

শ্রীরাগের পুত্র—সিন্ধু, মালু, গোন্দ্, কেহ কেহ এর পরিবর্তে কল্যাণ লিখেছেন। মতান্তরে হমীরও লিখিত হয়েছে।

গুণসাগর, কুম্ভ, শঙ্কর, মতান্তরে আগড় বা আকট, বেহাগরা। পুঁথিতে আর একটি নামের উল্লেখ করা হয়নি।

মেঘরাগের পুত্র—জলন্ধর, সারঙ্গ, নট, শঙ্করাভরণ, কল্যাণ, গজধর, গান্ধার, সাহানা।

চতুর্থ অধ্যায়

এই অধ্যায়ে কল্লিনাথ-মত বর্ণিত হয়েছে; প্রত্যেক রাগের ছটি করে রাগিণী। রাগগুলি হচ্ছে—শ্রী, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরোঁ, মেঘ ও নটনারায়ণ।

শ্রীরাগের ছটি রাগিণী—গৌরী, কোলাহল, ধূল, রৌরাবী, মালকোশ, দেওগান্ধার।

বসন্তরাগের ছটি রাগিণী—অন্ধওলী, গমকী, পটমঞ্জরী, গৌড়করী, ধামকী, দেওশাখ।

পঞ্চমের ছটি রাগিণী—ত্রবণী এবং বরারী ভিন্ন পুঁথিতে উক্ত অপর নামগুলি স্পষ্ট নয়।

ভৈরোঁর ছটি রাগিণী—ভৈরবী, গুজরী, ভাখা, বেলাওলী, কর্ণাটী, রক্তহংসা।

মেঘের ছটি রাগিণী—বঙ্গালী. মদহর, কামোদ, ধনাশ্রী। এতদ্ভিন্ন পুঁথিতে উক্ত নামগুলি স্পষ্ট নয়।

নটনারায়ণের ছটি রাগিণী—ত্র্যম্বকী (?), তিলকী, পূরবী, (পুঁথিতে চতুর্থ নামটি অস্পষ্ট), গান্ধারী, সিন্ধুমল্লারী।

এই মতে ছয় রাগের ছটি করে পুত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন হনুমান মত অনুসারেও শ্রীরাগ, ভৈরোঁরাগ এবং মেঘরাগ—এই তিন রাগের অস্তিত্ব রয়েছে। বর্তমানে (আনুমানিক ১৬৭৫) দুই মতের একটি সামঞ্জস্য করে নেওয়া হয়েছে: শ্রীরাগের পুত্র গোন্দ্, শঙ্কর ও বেহাগরার স্থানে কল্যাণ এবং অপর দুটি রাগের উল্লেখ করা হয়েছে। পুঁথিতে উক্ত এই দুটি নাম স্পষ্ট নয়। ভৈরোঁ রাগের পুত্র তিলক, পুরিয়া, পঞ্চম ও সুহর স্থানে দেওশাখ, ললত, মালকোশ ও বিলাবল লিখিত আছে; মেঘের পুত্র নটনারায়ণ, শঙ্করাভরণ ও কল্যাণের স্থলে কিদারা, মারু ও অপর একটি নাম লিখিত আছে। পুঁথিতে এই নামটি স্পষ্ট নয়। হিন্দোলের পুত্র বিভাসের

স্থানে অপর রাগ নির্দিষ্ট হয়েছে। দীপকের একটি পুত্রের স্থানে পঞ্চম নির্দিষ্ট হয়েছে। মালকোশের পুত্রদের মধ্যে নটনারায়ণ লিখিত আছে এবং মারু ও বড়হংসের স্থলে মস্তাঙ্গ্ লিখিত আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে সোমেশ্বরের মত অনুযায়ী রাগ, রাগিণী ও পুত্রাদির বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এই মত অনুসারে পুত্রসংখ্যা ছটি। রাগসমূহ হচ্ছে—শ্রী, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরোঁ, মেঘ এবং নটনারায়ণ।

শ্রীরাগের রাগিণী — মালবী, মালুয়া বা মারোয়া, ত্রবণী বা তরওয়ান, গৌরী, কেদারা, ভাড়কা বা ভাগুকা বা ভারী (বেহারী ?)।

বসন্তরাগের রাগিণী — দেশী, দেওগিরি, বিরাড়ী বা বিরারী, টোড়ী, ললতা বা ললত, হিন্দোলী বা হিন্দোল।

ভৈরোঁরাগের রাগিণী — ভৈরবী, গুঞ্জরী বা গুজরী, রেওয়া, গুণকরী বা গুণকলী, বঙ্গালী, বহলী।

পঞ্চমরাগের রাগিণী — বিভাস, ভূপালী, কর্ণাটী, বড়হংসকা বা বড়হংস, মালশ্রী, পটমঞ্জরী।

মেঘরাগের রাগিণী — মল্লার, শুধ্, সাবেরী, কৌশিকী বা মালকোশ, গান্ধারী বা গান্ধার, হরশৃঙ্গার।

নটনারায়ণের রাগিণী — কামোদ, কল্যাণ, আভিরী, নায়কী, সারঙ্গ, নটহমীর।

রাগিণীসমূহের ছটি করে পুত্র পরিকল্পিত হয়েছে। ঋতু বা কাল সম্বন্ধে এইরকম বলা হয়েছে—

রাগিণীসহ শ্রীরাগ শিশির ঋতুতে অর্থাৎ মাঘ ও ফাল্গুন মাসে গেয়। রাগিণীসহ বসন্তরাগ বসন্তঋতুতে অর্থাৎ চৈত্র ও বৈশাখ মাসে গেয়। রাগিণীসহ পঞ্চমরাগ শরৎকালে অর্থাৎ কাওয়ার (?) এবং কার্তিক মাসে গেয়। রাগিণীসহ ভৈরোঁ রাগ গ্রীষ্মঋতুতে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় মাসে গেয়। রাগিণীসহ মেঘরাগ বর্ষাঋতুতে অর্থাৎ শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে গেয়। রাগিণীসহ নটনারায়ণ হিমঋতুতে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসে গেয়।

ভূপালী, ভৈরবী, দেওসাখ, বেলাওল, মল্লার, বঙ্গালী, শ্যাম, গুজরী,

ধনাশ্রী, মালশ্রী, মেঘ, পঞ্চম, দেশকার, ভৈরোঁ, ললত, বসন্ত, মধ্মাধ্, বিভাস—এই রাগসমূহ প্রাতঃকালে গেয়।

কৌশিক, সাবেরী, পটমঞ্জরী, রেওয়া, গুণকরী, রামকরী, সুরঠী—এইগুলি দিবসের প্রথম প্রহরে গেয়।

বিরারী, টোড়ী, কামোদ, কুড়ায়ী, গান্ধারী, নাগশব্দ, দেশী, শঙ্করাভরণ—এই রাগসমূহ দিবা দ্বিপ্রহরে গেয়।

শ্রীরাগ, মালোয়া, গৌরী, ত্রবণ, নট, কল্যাণ, নন্দ, কেদারা, কর্ণাটী, আভিরী, বড়হংস, বাহারী ও বৃহন্নট—এইগুলি দিবসের তৃতীয় প্রহর থেকে অর্ধরাত্র পর্যন্ত কালে গেয়।

এতদ্ব্যতীত শ্রোতার বিশেষ ইচ্ছা অনুসারেও এইসব রাগ সময়নির্বিশেষে গাওয়া যেতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভরত মত অনুসারে রাগ, রাগিণী ও পুত্রাদির বর্ণনা। এই মতে ছটি রাগ স্বীকৃত—ভৈরোঁ, মালকোশ, হিন্দোল, দীপক, শ্রী ও মেঘ। প্রত্যেক রাগের পাঁচটি রাগিণী ও আটটি পুত্র এবং প্রত্যেক পুত্রের একটি করে ভার্যাও স্বীকৃত হয়েছে।

ভৈরোঁর রাগিণী — মধ্মাধ্, ললত, বরারী, ভৈরবী, বহলী।

মালকোশের রাগিণী — গৌরী, উদয়াবতী (পুঁথিতে এই রাগটি অস্পষ্ট), খাম্বায়তী, ককুভ।

হিন্দোলের রাগিণী — রামকলী, বেলাওলী, আসাওরী, দেওয়ারী, গুণকলী।

দীপকের রাগিণী — কেদারা, গৌরী, গোন্দ, গুজরী, রউরাবনী (?)।

শ্রীরাগের রাগিণী — সিন্ধবী, কাফী—হিন্দীতে এর আসল নাম জানা নেই, ঠুমরী—দোআব (গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী স্থান) অঞ্চলে এটি বেশী গাওয়া হয়।

মেঘরাগের রাগিণী — মল্লার, সারঙ্গী, দেশী, রতিবল্লভ (?), কাবেরী (?)।

ভৈরোঁরাগের পুত্র — দেওশাখ, ললত, বরখ্, মাধু, বেলাবল, বঙ্গাল, বিভাস, পঞ্চম।

আটটি ভার্যা — সুহা, বেলাবলী, সুরটী, গম্ভারী, অন্দাহী (?), বহুলগুজরী, পটমঞ্জরী, মারোয়ী।

মালকোশের পুত্র — গান্ধারী, শুধ্, মকর, চতুর্থ নামটি পুঁথিতে অস্পষ্ট, শাহানা, শক্তিবল্লভ (?), মালীগৌরা, কামোদ।

আটটি ভার্যা — ধনাশ্রী, মালশ্রী, চৈতগৌরী, সুভ্রায়ী, দরগা, গান্ধারী, কামোদী। আর একটি নাম পুঁথিতে দেওয়া নেই।

হিন্দোলের পুত্র — বসন্ত, মালোয়া, মারু, কোশল, বোখারবন্দ (?), লঙ্কাদহন, নাগধ্বনি, ধুল।

আটটি ভার্যা — লীলাবতী, চৈতী, পার্বতী, ত্রবণ, দেওগিরি, সরস্বতী। দুটি নাম পুঁথিতে স্পষ্ট নয়।

দীপক রাগের পুত্র — কুসুম, টঙ্ক, নটনারায়ণ, বেহাগরা, ফিরোদস্ত, রাসমঙ্গলা বা রহসমঙ্গল, মঙ্গলাষ্টক, আড়ানা।

আটটি ভার্যা — মঙ্গলগুজরী, জয়জয়ন্তী, মালগুজরী, ভূপালী, মনোহর, আভীরী, ইমন, হামীর।

মেঘরাগের পুত্র — কলায়ের, বাগেশ্বরী, শাহানা (এই রাগটিকে মালকোশের পুত্র হিসাবেও দেখানো হয়েছে এবং এ সম্বন্ধে কোন কারণ নির্দেশ করা হয়নি;) পুরিয়া, কানড়া, তিলক, আসন্ত্ (?), শঙ্করাভরণ।

আটটি ভার্যা — কর্ণানট (?), কাহ্নী (?), কদমনাট, বেহারী, মাঝ্, পরজ, নটমঞ্জরী, শুধ্নাট।

সপ্তম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে রাগরাগিণীর মিশ্রণে উৎপন্ন সুরগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। মিশ্রিত রূপ তিন প্রকার—শুধ্, সালঙ্ক ও সঙ্কীর্ণ। শুধ্ পর্যায়ে এক রাগের সঙ্গে অপর রাগের মিশ্রণ হয় না। সালঙ্ক পর্যায়ে দুটি রাগের মিশ্রণ না হয়ে রাগ এবং রাগিণীর মিশ্রণ হবে। কোনও কোনও মতে রাগিণী ও পুত্রদের সঙ্কীর্ণ পর্যায়ে ফেলা হয়। কেহ কেহ নিজের ইচ্ছা অনুসারে সৌন্দর্যের জন্য কয়েকটি রাগ একত্র করে সালঙ্ক বলে থাকেন। কেহ কেহ রাগসমূহের মিশ্রণকেও সঙ্কীর্ণ বলে থাকেন। বিশেষ ক্ষেত্রে মালকোশ এবং দীপকের মিশ্রণ করা হয় এবং কেহ কেহ এই মিশ্রণকেও সঙ্কীর্ণ বলেন। কোনও মতে

কানড়া, সারঙ্গ, গুজরী, নট, মল্লার, টোড়ী এবং গৌরী—এই সাতটি মোকামকে (রাগ) শুদ্ধ বলে স্বীকার করা হয় এবং দেশকার, বিভাস, ললত, রেওয়া, বেলাওল, মেঘ, সুরট, ধনাশ্রী, গৌরা, শ্রী, দীপক, কাফী (?), কেদারা—এই তেরটি মোকামকে সালঙ্ক বলে চিহ্নিত করা হয়। অবশিষ্ট সমস্ত রাগিণী ও পুত্রকে সঙ্কীর্ণ বলে স্বীকার করা হয়।

সঙ্কীর্ণের রূপায়ণে যে মিশ্রণ ঘটে তা বিধিসম্মত হওয়া প্রয়োজন। দুটি রাগের মিশ্রণ এমনভাবে করা ভাল যাতে একটি রাগ আর একটির ভিতর উত্তমরূপে প্রবেশ করতে পারে। কোনও কোনও মতে মিশ্ররাগে মূলরাগটি পরে আসে; যেমন পুরিয়া ধনাশ্রী। কেহ কেহ প্রথমটি আগে গান; আবার কেহ কেহ অন্যরীতি পছন্দ করেন। এটি ইচ্ছাধীন। শ্যামের সঙ্গে রামকলী যোগ করলে শ্যাম প্রথমে আসবে এবং রামকলী পরে আসবে। একে শ্যামরাম বলা হয়। আগে রামকলী এলে তাকে রামশ্যাম বলা হয়।

কয়েকটি সঙ্কীর্ণ পর্যায়ের রাগের উল্লেখ করা হয়েছে—

শুধ্ নাট — বাগেশ্বরী, পুরিয়া, মধ্মাধ্।

কেদার নাট — নাটের সঙ্গে কেদারার মিশ্রণ।

আভীর নাট — নাটের সঙ্গে আভীরীর মিশ্রণ।

হামীর নাট — নাটের সঙ্গে হামীরের মিশ্রণ।

কামোদ নাট — নাটের সঙ্গে কামোদের মিশ্রণ।

সারঙ্গ নাট — নাটের সঙ্গে সারঙ্গের মিশ্রণ।

মল্লার নাট — নাটের সঙ্গে মল্লারের মিশ্রণ।

কল্যাণ নাট — নাটের সঙ্গে কল্যাণের মিশ্রণ।

জহন নট (?) — কোকব, বেলাওল, পূর্বী, কেদারা।

নট নারায়ণ — শঙ্করাভরণ, মধ্মাধ্, লঙ্কাদহন, বেলাওল।

কদম নাট — ধনাশ্রী, ধূল, কানড়া, আহিরী, কেদারা, শুধ্, মধ্মাধ্। কেহ কেহ ধনাশ্রীর স্থলে বাগেশ্রী এবং আহিরীর স্থলে আহীর নাট প্রয়োগ করেন।

রাজনারায়ণ নট — গান্ডারী, পুরিয়া, টোড়ী।

কামোদ — গৌড়, বেলাওল।

শুধ্ কামোদ — কামোদের সঙ্গে শুধ্-এর মিশ্রণ।

কল্যাণ কামোদ — কামোদের সঙ্গে কল্যাণের মিশ্রণ। কেহ কেহ একে কল্যাণবিনোদ নামও দিয়ে থাকেন।

সাওন্ত কামোদ — কামোদের সঙ্গে কেদারার মিশ্রণ।

তিলক কামোদ — কামোদের সঙ্গে খটরাগের মিশ্রণ।

বাগেশ্বরী — কানাড়ার সঙ্গে ধনাশ্রীর মিশ্রণ।

সাহানা — কানাড়ার সঙ্গে ফিরোদস্ত-এর মিশ্রণ।

আড়ানা — কানাড়ার সঙ্গে মল্লারের মিশ্রণ।

পুরিয়া — কানাড়ার সঙ্গে ধূলশ্রী, টঙ্ক, মঙ্গলাষ্টক এই তিনটির মিশ্রণ।

শুধ্‌ কল্যাণ — টঙ্ক, কামোদ ও গোন্দ-এর মিশ্রণ।

হামির — শুধ্‌ কল্যাণের সঙ্গে কেদারা ও ইমনের মিশ্রণ। কথিত আছে গৌরীনাথ এই রাগটি গেয়েছিলেন।

ইমন — শুধ্‌ কল্যাণের সঙ্গে কেদারা ও বেলাবলের মিশ্রণ।

ক্ষেমকল্যাণ — কেদারা ও হামিরের মিশ্রণ। কেহ কেহ কানড়া, সরস্বতী ও শুধ্‌ মিশ্রিত করেও ক্ষেমকল্যাণ নাম দিয়ে থাকেন।

জেত কল্যাণ — জেতশ্রী ও শুধ্‌ কল্যাণের মিশ্রণ।

ধনাশ্রী — টোড়ী, আসাওরী এবং মারুর মিশ্রণ।

মালশ্রী — শঙ্করাভরণ, কেদারা, মধ্‌মাধ্‌ ও সরস্বতীর মিশ্রণ।

জেতশ্রী — ধূল, বিরারী ও দেশকারের মিশ্রণ।

ধূলশ্রী — জেতশ্রীর সঙ্গে বেলাবলের মিশ্রণ।

খট্ — বিরারী, আসাওরী, টোড়ী, শ্যাম, বহুলী এবং গান্ধারের মিশ্রণ। কেহ কেহ বহুলীর স্থলে বহুল-গুজরী প্রয়োগ করেন। কেহ কেহ শ্যামের স্থলে গুজরী ও বহুলী প্রয়োগ করে থাকেন। ছটি রাগের মিশ্রণেই খট্ রাগের সৃষ্টি হয়েছে।

সুরাষ্টক — গান্ধার, গুজরী, বঙ্গাল, পঞ্চম এবং ভৈরবীর মিশ্রণ।

গোন্দকলী — গুজরী এবং আসাওরীর মিশ্রণ। একে গৌরও বলা হয়।

গাম্ভারী — সুরাষ্টক ও ধনাশ্রীর মিশ্রণ। একে গণেশও বলা হয়।

মধ্‌মাধ্‌ — মল্লার, শুধ্‌ কল্যাণ ও মালশ্রীর মিশ্রণ।

সরস্বতী — নটনারায়ণ, শঙ্করাভরণ ও শুধ্‌-এর মিশ্রণ।

বড়হংস — মারোয়া, রুদ্রাণী, চৈতি, দুর্গা ও ধনাশ্রীর মিশ্রণ।

লঙ্কাদহন — বেহারী ও কেদারার মিশ্রণ। একে হনুনট্‌ও বলা হয়।

শক্তিবল্লভ — শঙ্করী, রামকলী, গান্ধার, গুজরী এবং শ্যামপুরবীর মিশ্রণ।

শঙ্করাভরণ — কেদারা এবং বেলাওলের মিশ্রণ। মহাদেব এটি গেয়েছিলেন এইরকম বলা হয়ে থাকে।

গান্ধার — সিন্ধুলা, আসাওরী, গৌরী, দেওগিরি ও হিন্দোলের মিশ্রণ।

ফিরোদস্ত—পূর্বীশ্যাম ও গৌরীর মিশ্রণ। এটি আমীর খুসরও গেয়েছিলেন বলে কথিত আছে।

পটমঞ্জরী— মারু, ধূল, ধনাশ্রী ও গাম্ভারীর মিশ্রণ

দেওশাখ— শঙ্করাভরণ, শুধ্‌, মল্লার এবং কানাড়ার মিশ্রণ।

বেলাওলী—বেলাওল এবং গৌরসারঙ্গ-এর মিশ্রণ। কেহ কেহ গৌর-সারঙ্গের স্থলে সারঙ্গ প্রয়োগ করেন।

কামোদী— সুরাষ্টক এবং গৌরীর মিশ্রণ। মতান্তরে সুভ্রাগ্নী এবং সুরঠীর মিশ্রণ।

কহঙ্গ (?)—মারু, ধূল, জেতশ্রী ও কেদারার মিশ্রণ।

পার্বতী—দেওগুজরী, গোন্দ, গৌরী ও পূর্বীর মিশ্রণ।

ভীমপলাশী—ধনাশ্রী, শুধ্‌ ও পূর্বীর মিশ্রণ।

রম্ভাবতী—মালশ্রী, শুধ্‌ ও বেলাওলের মিশ্রণ।

গান্ধারী—খট্, আসাওরী এবং দেশীর মিশ্রণ।

বরারী—দেশকার, টোড়ী এবং ত্রবণের মিশ্রণ।

বেহাগরা—কেদার, মারু এবং সরস্বতীর মিশ্রণ।

লীলাবতী—দেশকার, শ্রী, ললত-এর মিশ্রণ।

মনোহর—মারোয়া, ত্রবণ ও গৌরীর মিশ্রণ। মতান্তরে মারোয়া, ত্রবণ ও বেহারী।

টঙ্ক— শ্রী, কানাড়া এবং ভৈরোঁর মিশ্রণ।

নাগধ্বনি—মল্লার, কেদারা এবং সুহর মিশ্রণ।

আহিরী—কল্যাণ, দেশকার, গুজরী এবং শ্যামের মিশ্রণ। কেহ কেহ একে আভিরী বলে থাকেন। এটি কানাই গেয়েছিলেন।

রবহংসমঙ্গল—শঙ্করাভরণ, আড়ানা এবং সুরটীর মিশ্রণ। একে রহংস-মঙ্গল বা রহংসমঙ্গলাও বলা হয়।

রাজনারায়ণ—মালোয়া, শ্রী এবং মনোহরের মিশ্রণ। ভরতের মত অনুসারে এটি নারদ কর্তৃক গীত হয়েছিল।

শ্রীসমুধ—মালশ্রী, শ্রীরাগ, ভামপলাশী এবং টঙ্কের মিশ্রণ।

দেশী—টোড়ী এবং খট রাগের মিশ্রণ।

হংসী—ধুলশ্রী এবং গোন্দের মিশ্রণ

দেওগিরি—পূর্বী, সারঙ্গ ও শুধ্-এর মিশ্রণ। কথিত আছে যে এটি দেবতাগণ গেয়েছিলেন।

কোলাহল—বেহাগরা, কল্যাণ ও কানাড়ার মিশ্রণ।

ককভ—বেলাওল, পূর্বী, কেদারা, দেওগিরি ও মাধুর মিশ্রণ।

দেওযারী—গান্ধারী, মালশ্রী ও সরস্বতীর মিশ্রণ।

গুজরী—ললিতা ও রামকরির মিশ্রণ।

মঙ্গলগুজরী—রামকলী, শ্যাম, গান্ধার ও মঙ্গলাষ্টকের মিশ্রণ। কেহ কেহ মঙ্গলাষ্টকের স্থলে বহুলী প্রয়োগ করেন।

মালগুজরী—রামকলী, শ্যাম, গান্ধার ও গুজরীর মিশ্রণ।

বিচিত্রা—শ্রীরওন, চৈতী, গৌরী ও বরারীর মিশ্রণ।

ত্রবণ বা তরোয়ান—দেশকার, গুজরী ও পূর্বীর মিশ্রণ। কেহ কেহ পূর্বীর স্থলে ললত প্রয়োগ করেন; কেহ কেহ বিভাসও প্রয়োগ করেন।

কুলায়ী—নটনারায়ণ, আড়ানা ও বেলাওলের মিশ্রণ। কেহ কেহ বেলাওল, ও কানাড়ার মিশ্রণে উৎপন্ন বলে থাকেন। এটি সাধারণ্যে কুড়ায়ী এবং সুড়ায়ী নামেও পরিচিত।

শ্রী—বড়হংস, টঙ্ক ও গৌরীর মিশ্রণ।

কেদারা—কোকভ, পূর্বী ও বেলাওলের মিশ্রণ।

হিন্দোল—লীলাবতী, ললত, পঞ্চম, পুরিয়া এবং ভৈরোঁর মিশ্রণ।

মেঘ—কল্যাণ, কামোদ এবং সাওন্তের মিশ্রণ।

বসন্ত—দেওগিরি, নট, মল্লার, সারঙ্গ এবং বেলাওলের মিশ্রণ।

ভৈরোঁ—হিন্দোল, শুধ্, কানাড়া এবং পুরিয়ার মিশ্রণ।

শঙ্করোন—সুরট, লঙ্কাদহন ও বেলাওলের মিশ্রণ।

বহুলগুজরী—দেশকার, বঙ্গাল, রামকরি ও গুজরীর মিশ্রণ।

ভৈরবী—বরারি, ললত, শুধ্,সারঙ্গ, পঞ্চম ও বেলাওলের মিশ্রণ।

বহুলী—রামকরি, গুজরী, দেশকার, বঙ্গাল ও পঞ্চমের মিশ্রণ। কেহ কেহ বঙ্গালের স্থলে টঙ্ক প্রয়োগ করেন।

ললত—দেশী, বিভাস, ও পঞ্চমের মিশ্রণ। কেহ কেহ দেওশাখ, বঙ্গাল, ধুল ও বিভাসের মিশ্রণে উৎপন্ন বলে মনে করেন।

হর্থ (হর্ষ)—দেওশাখ, লীলাবতী, সারঙ্গ, শুধ্, মল্লার ও গোন্দের মিশ্রণ।

মাধু —শুধ্, মল্লার, বেলাওল ও নটনারায়ণের মিশ্রণ।

বেলাওল—কল্যাণ ও কেদারার মিশ্রণ।

বঙ্গাল—ধনাশ্রী, মারু ও ললতের মিশ্রণ। কেহ কেহ গোন্দ ও গুজরীর মিশ্রণে প্রস্তুত বলে মনে করেন।

বিভাস—বেলাওল, গুজরী এবং আসাওরীর মিশ্রণ।

পঞ্চম —ললত ও বসন্তের মিশ্রণ। কেহ কেহ গান্ধার, মনোহর এবং হিন্দোলের মিশ্রণে উৎপন্ন বলে মনে করেন।

সুহ —মালশ্রী, বেলাওল ও বিভাসের মিশ্রণ। কেহ কেহ বিভাসের স্থলে শুধ্ অথবা বাগেশ্বরী প্রয়োগ করেন।

সুরট —গুজরী, পঞ্চম, ভৈরবী, গান্ধার ও বঙ্গালের মিশ্রণ।

গৌরী —জয়জয়ন্তী, আসাওরী, গুজরী ও সুরটের মিশ্রণ। কেহ কেহ সুহ ও কানাড়ার মিশ্রণে উৎপন্ন বলে মনে করেন।

মালকোশ—কুলায়ির (?), কিরুয়ী (?), ভখার, বড়হংস, শুধ্, নাট, টঙ্ক ও বাহারের মিশ্রণ। কেহ কেহ হিন্দোল, বসন্ত, জয়জয়ন্তী, পঞ্চম, খট্, মারু, সারঙ্গ ও শাওনীর মিশ্রণে উৎপন্ন বলে মনে করেন।

টোড়ী —আসাওরী, ধনাশ্রী, খটরাগের মিশ্রণ। কেহ কেহ ললত, ধনাশ্রী এবং ধুলশ্রীর মিশ্রণে উৎপন্ন বলে মনে করেন।

খম্বাবতী—মালশ্রী ও মল্লারের মিশ্রণ।

ত্রিছন (ত্রিক্ষণ)—বিজয়া, বড়হংস ও দেশীর মিশ্রণ।

গৌরী—গৌরী ও সুরটের মিশ্রণ।

দুর্গা—মালশ্রী, লীলাবতী, গৌরী ও সারঙ্গের মিশ্রণ।

মালাবতী—পঞ্চম, কামোদ, শুধ্, নট ও হামীরের মিশ্রণ।

মালোয়া—গৌরী, পরজ ও বিভাসের মিশ্রণ।

মারু—গৌরী, পরজ ও সুরটের মিশ্রণ।

ভখার—ফিরোদস্ত ও ত্রিক্ষণের মিশ্রণ।

কিরুয়ী—সারঙ্গ, সুহা, গুজরী ও গৌরীর মিশ্রণ। কেহ কেহ গৌরী, গোন্দ ও দেওগিরির মিশ্রণে উৎপন্ন বলে মনে করেন।

চৈতী—সাওন্ত, ললত ও পূর্বীর মিশ্রণ।

পূর্বী—মালোয়া ও গৌরীর মিশ্রণ। কেহ কেহ গৌরী, গোন্দ ও দেওগিরির মিশ্রণে উৎপন্ন বলে মনে করেন।

রৌরাবী—ললত, লীলাবতী, চৈতি ও পঞ্চমের মিশ্রণ।

দীপক—কেদারা, কামোদ, শুধ্, নাট ও বাগেশ্বরীর মিশ্রণ।

গোন্দ—ধনাশ্রী, মল্লার ও বেলাওলের মিশ্রণ।

মঙ্গলাষ্টক—জয়েৎশ্রী, কানাড়া, কেদারা ও কল্যাণের মিশ্রণ। কেহ কেহ শ্যামরাগও যুক্ত করেন।

জয়জয়ন্তী—সুরট, ধূলশ্রী ও বেলাওলের মিশ্রণ।

ভূপালী —গোন্দ ও কল্যাণের মিশ্রণ। কেহ কেহ বেলাওল ও কল্যাণের মিশ্রণে উৎপন্ন বলে মনে করেন।

কাফী —শঙ্করাভরণ ও গৌরীর মিশ্রণ।

ঠুমরী —শঙ্করাভরণ ও মারুর মিশ্রণ।

সরস্বতী —মালোয়া, ইমন ও সুরটের মিশ্রণ।

সাওন্ত —সারঙ্গ ও মল্লারের মিশ্রণ। কেহ কেহ কেদারা ও কামোদের মিশ্রণে উৎপন্ন বলে মনে করেন। কেহ কেহ সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য এর সঙ্গে কানাড়াও যোগ করেন।

রাগেশ্বর—ভৈরোঁ, গৌরী, কেদারা, দেওগিরি, গান্ধার, সিন্ধুড়া, ধনাশ্রী, কানাড়া ও আসাওরীর মিশ্রণ।

বিজয়া —টোড়ী, গান্ভারী ও পুরিয়ার মিশ্রণ।

ধ্যানজ্যোতি—টোড়ী, বিভাস ও সাহানার মিশ্রণ।

কুম্ভ—ধনাশ্রী ও সরস্বতীর মিশ্রণ।

সুরোদ—ভৈরো, সুহা ও শুধ্-এর মিশ্রণ।

খেম (ক্ষেম?)—কানাড়া, সরস্বতী ও কল্যাণের মিশ্রণ।

শশিরেখা—ললত, পঞ্চম, তিলক, সারঙ্গ ও সুহর মিশ্রণ।

মল্লার—সারঙ্গ, সুরট ও বেলাওলের মিশ্রণ। কেহ কেহ নট, সারঙ্গ ও মেঘের মিশ্রণে উৎপন্ন বলে মনে করেন।

সারঙ্গ—দেওগিরি, মল্লার ও নটের মিশ্রণ। কেহ কেহ মারু ও মল্লারের মিশ্রণে উৎপন্ন বলে মনে করেন।

রতিবল্লভ—নট, সারঙ্গ, ভৈরোঁ, ললত ও পঞ্চমের মিশ্রণ।

গৌরা—গৌরী, নট ও ত্রবণের মিশ্রণ

কুলায়ির—বেলাওল, কানড়া, নট ও মল্লারের মিশ্রণ।

শুভ—মালশ্রী, শুধ্ ও মল্লারের মিশ্রণ।

দেশকার—সরস্বতী, পরজ ও সুরটের মিশ্রণ।

করতান-নট—পঞ্চম, ললত, বিভাস ও গুজরীর মিশ্রণ।

কাহ্নয়ী (?)—সারঙ্গ, সুরট, বেলাওল ও মল্লারের মিশ্রণ।

পাহাড়ী—মারু ও শঙ্করাভরণের মিশ্রণ।

মারু—সারঙ্গ, সুরট, বেলাওল ও মল্লারের মিশ্রণ।

পরজ—ধনাশ্রী, মারু ও গান্ধারের মিশ্রণ। কেহ কেহ মারু, টোড়ী ও আসাওরীর মিশ্রণে উৎপন্ন বলে মনে করেন।

নাটমঞ্জরী—মালশ্রী ও নটের মিশ্রণ

গুণকলী—দেশী, টোড়ী, ললত, আসাওরী, দেশকার ও গুজরীর মিশ্রণ।

ত্রবণী—নটনারায়ণ, জয়েৎশ্রী ও শঙ্করাভরণের মিশ্রণ।

পর্ণবী (?)—দেওগিরি, পূর্বী, গৌরী ও গোন্দের মিশ্রণ।

ঘণ্টা—মারু, কেদারা, জয়েৎশ্রী ও শ্রীরাগের মিশ্রণ।

মধুমিথুন বা মাধবী—নটনারায়ণ, মল্লার, শুধ্, হামির ও মধ্ মাধ্ধ-এর মিশ্রণ। কানাই (শ্রীকৃষ্ণ) এই রাগ গান করেন এইরূপ কথিত আছে।

করম পঞ্চম—ললত, বসন্ত, হিন্দোল এবং দেশকারের মিশ্রণ।

শিবরতি— বড়হংস ও সিন্ধবীর মিশ্রণ। কথিত আছে কামদেবের পত্নী রতি এটি গেয়েছিলেন।

সিন্ধবী বা সিন্ধুড়া—আসাওরী ও আহিরীর মিশ্রণ।

মারোয়া—ললত, দেওশাখ, কানাড়া ও শ্রীরাগের মিশ্রণ।

কলাপরীন (কলাপ্রবীণ)—কোকৎ (?), কানাড়া ও সুহার মিশ্রণ। কথিত আছে এটি নারদের সৃষ্টি।

দীপাবতী—দীপক ও সরস্বতীর মিশ্রণ।

অনুপরূপ—ধনাশ্রী ও টোড়ীর মিশ্রণ।

চৈতী গৌরী—ললত ও গৌরীর মিশ্রণ।

গৌরসারঙ্গ—গৌরা ও সারঙ্গের মিশ্রণ। কেহ কেহ গৌরী ও সারঙ্গের মিশ্রণ করে থাকেন।

কাপুর গৌরী—চৈতী, খাম্বাবতী, জেতশ্রী, আহিরী, টঙ্ক ও বরারীর মিশ্রণ।

অষ্টম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে পরবর্তীকালের মিশ্ররাগ অর্থাৎ আমীর খুসরও প্রভৃতির রচনাসমূহ বর্ণিত হয়েছে। খুসরও বারোটি রাগ সৃষ্টি করেছিলেন এবং প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক নাম রেখেছিলেন।

মহীর—ঘারা ও ফার্সী মোকাম থেকে একটি মোকামের সহযোগে সৃষ্ট। কেহ কেহ বলেন এটি টোড়ী এবং ইরাকের মিশ্রণে রচিত।

সাজগিরী—পূর্বী, গৌরা, বঙ্গালী এবং একটি ফার্সী মোকামের মিশ্রণে সৃষ্ট। কেহ কেহ পূর্বীর স্থলে বিভাস প্রযুক্ত হয়েছে বলে মনে করেন।

ইমন—হিন্দোল এবং একটি ফার্সী মোকামের মিশ্রণে সৃষ্ট। কেহ কেহ ইমনী ও একটি ফার্সী মোকাম সহযোগে রচিত বলে মনে করেন।

উশ্শাক—সারঙ্গ, বসন্ত ও একটি ফার্সী মোকাম সহযোগে রচিত।

মুআফ্ফেক্—টোড়ী, মালশ্রী, দুগাহ্ ও চৈতীর মিশ্রণে সৃষ্ট। এই রাগটিকে দিওআলীও বলা হয়।

ঘনম্—পূর্বীকে বহুলভাবে পরিবর্তন করে এটি রচিত হয়েছে।

জীলফ্—খট্‌রাগকে বহুলভাবে পরিবর্তন করে এটি রচিত হয়েছে।

ফরঘানা—গুনকলী ও গৌরীর মিশ্রণে সৃষ্ট।

সর্পর্দা—গৌরসারঙ্গ এবং একটি ফার্সী মোকাম সহযোগে রচিত। কেহ কেহ গোন্দ, বেলাওল, পুরিয়া ও একটি ফার্সী মোকামের মিশ্রণে সৃষ্ট বলে মনে করেন।

বাখরিজ—দেশকার ও একটি ফার্সী মোকাম সহযোগে রচিত।

ফিরুদস্ত—কানাড়া, গৌরী, পূর্বী, সারঙ্গ ও একটি ফার্সী মোকামের মিশ্রণে রচিত।

সনম্—কল্যাণ ও একটি ফার্সী মোকাম সহযোগে রচিত। মতান্তরে পটমঞ্জরী ও একটি ফার্সী মোকাম সহযোগে রচিত।

সুলতান হুসেন শর্কী ও অপরাপর ওস্তাদসমূহের রচিত রাগ। প্রথমে সুলতান হুসেন শর্কীর রচিত রাগসমূহের উল্লেখ করা হচ্ছে। তিনি শ্যামরাগের বারোটি প্রকারভেদ, টোড়ীর চারটি প্রকারভেদ, আসাওরীর একটি প্রকারভেদ নির্ণয় করেছিলেন। যথা—

গৌরশ্যাম, মল্লারশ্যাম, ভূপালশ্যাম, কানড়শ্যাম, সুহশ্যাম, পূর্বীশ্যাম, শ্যামরাম, মেঘশ্যাম, বসন্তশ্যাম, বরারীশ্যাম, কুড়ারীশ্যাম এবং গোন্দশ্যাম।

জৌনপুরী টোড়ী, রামটোড়ী, রসুলী টোড়ী এবং ভূপালী টোড়ী।

জৌনপুরী টোড়ীতে মালশ্রী ও মুআফ্ফেক্ মিশ্রিত করা হয়। রামটোড়ীতে রামকলী ও মালশ্রী মিশ্রিত করা হয়। রসুলী টোড়ীতে মুলতানী ধনাশ্রী যোগ করা হয়। ভূপালী টোড়ীতেও একটি রাগ মিশ্রিত করা হয়। শেষোক্ত রাগটি কম গাওয়া হয়। আসাওরীতে জৌনপুরী টোড়ী মিশ্রিত করে এটিকে জৌনপুরী আসাওরী নাম দেওয়া হয়েছে।

মুখদুম বাহাউদ্দীন জ্যাকেরিয়া ধনাশ্রীতে টোড়ী ও মালশ্রী যোগ করে মুলতানী ধনাশ্রী নাম দিয়েছিলেন। তিনি ধনাশ্রী ও পুরিয়াতে আসাওরী ও নায়কী যোগ করে পুরিয়া ধনাশ্রী নাম প্রদান করেন।

নায়ক বক্সু টোড়ীতে দেশকার যোগ করে বাহাদুরী নাম প্রদান করেন। নামটি সুলতান বাহাদুর গুজরাটীর নাম অনুসারে রাখা হয়েছে। অপরটি কানড়াশ্যাম রাগে খমাইচীর সহযোগে নায়কী কানাড়া নামে খ্যাত হয়। এইভাবে কল্যাণরাগকে পরিবর্তন করে নায়কীকল্যাণ নামে প্রচার করা হয়। মিয়া তানসেন কানাড়ায় মল্লার ও কল্যাণ যোগ করে দরবারী কানাড়া নাম প্রদান করেন। পরে আকবরের সান্নিধ্যে এসে এই উদ্ভাবনীটি প্রদর্শন করেন ও নামটি পাকা করে নেন। অপরটি আসাওরীতে দেওগান্ধার সহযোগে যোগিয়া আসাওরী নাম গ্রহণ করে।

এইভাবে ওস্তাদগণ পূর্বাচরিত প্রথা অনুযায়ী এক একটি রাগে পরিবর্তন সাধন করে এক একটি নাম দিয়েছেন। বর্তমানেও শিক্ষা এবং সৃজনপ্রতিভা অনুসারে যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরা তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী এইরূপ পরিবর্তনের প্রয়াস করে থাকেন।

নবম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে ফার্সী মোকাম, শুবা ও গোশা সম্বন্ধীয় বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। পারস্য অঞ্চলের সঙ্গীতে মোকাম রাগের অনুরূপ। বারোটি মোকাম প্রচলিত। এই নামগুলি দেওয়া হল—

রেহাবী, হুসেনী, রাস্ত, হিজাজ, বুজুর্গ, কোচক, ইরাক, ইসফাহান বা ইসফাহাঙ্গ, নওয়া, উশ্শাক, জঙ্গুলা ও বুশালিক।

প্রত্যেক মোকামের দুটি করে শুবা আছে। এইগুলি রাগিণীর অনুরূপ। প্রথম শুবাটি মোকামের খাদের দিক থেকে এবং দ্বিতীয়টি মোকামের চড়ার দিক থেকে উদ্ভূত।

রেহাবীর শুবা—নওরোজ-ই-আরব। এটি ছটি নাঘ্‌মার (স্বর) মিশ্রণে রচিত। এটি মোকামের খাদের দিক থেকে উত্থিত।

নওরোজ-ই-আজম। এটিও ছটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে প্রস্তুত। এটি মোকামের উর্ধ্বভাগ থেকে উত্থিত। বাকি শুবাগুলিও অনুরূপভাবে মোকামসমূহের নীচের দিক থেকে এবং উপর দিক থেকে উত্থিত।

হুসেনীর শুবা—দুগাহ্‌। ছটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত। মুহাইয়্যির। আটটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত।

রাস্তের শুবা—মুবার্কা। আটটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত। কেহ কেহ নটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত বলে মনে করেন। পাঞ্চগাহ। পাঁচটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত।

হিজাজের শুবা—সেহ্‌গাহ্‌। তিনটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত। হিসার। আটটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত।

বুজুর্গের শুবা—হুমায়ুন। চারটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত। নিহুফৎ। আটটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত। কেহ কেহ দশটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত বলে মনে করেন।

কোচকের শুবা—রকব্‌। তিনটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত। বয়াতী। পাঁচটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত।

ইরাকের শুবা—মুখালিফ্‌। একে ওয়ারী (?) ইরাকও বলা হয়। পাঁচটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত। মঘ্‌লব্‌। আটটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত।

ইসফাহানের শুবা—নীরিজ। পাঁচটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত। নিশাপূরক। ছটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত।

নওআ-র শুবা—নওরোজ-ই-খারা। পাচটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে প্রস্তুত। মাহুর—ছটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে প্রস্তুত।

উশ্‌শাকের শুবা—জাবুল। তিনটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত। আউজ। আটটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত। কেহ কেহ দুটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত বলে থাকেন।

জঙ্গুলার শুবা—চারগাহ্‌। চারটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত। ঘজাল। পাঁচটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত।

বুশালিকের শুবা—আশীরান। দশটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত। সবা। পাঁচটি নাঘ্‌মার মিশ্রণে রচিত।

আওআজ সমূহের নাম।

শল্মক—এটি ইস্‌ফাহানের নীচের দিক থেকে এবং জঙ্গুলার চড়ার দিক থেকে উত্থিত হয়।

করওআম্বাহ্‌—এটি ইরাকের নীচের দিক থেকে এবং রাস্তের চড়ার দিক থেকে উত্থিত হয়।

নওরোজ—এটি বুশালিকের নীচের দিক থেকে এবং হুসেনীর চড়ার দিক থেকে উত্থিত হয়।

কোশত—এটি হিজাজের নীচের দিক থেকে এবং নওআ-র চড়ার দিক থেকে উত্থিত হয়। এটি ছটি নাঘ্‌মায় রচিত।

মাদাহ্‌—এটি কোচকের নীচের দিক থেকে এবং ইরাকের চড়ার দিক থেকে উত্থিত হয়। এটি পাঁচটি নাঘ্‌মায় রচিত।

শাহ্‌বাজ—এটি বুজুর্গের নীচের দিক থেকে এবং রেহাবীর চড়ার দিক থেকে উত্থিত হয়। এটি ছটি নাঘ্‌মায় রচিত।

অতঃপর লেখক আটচল্লিশটি গোশার উল্লেখ করেছেন বলে লিখিত আছে কিন্তু পুঁথিতে কেবলমাত্র এইগুলির উল্লেখ আছে। যথা—

হারুত, ঘুরিব, সওআরা, ঘম্‌জিদা বা ঘম্‌জদা, বয়াৎ-ই-তুর্ক, সরুআফরাজ, বস্তানিগার, বয়াৎ-ই-করদম্বা, নিহাওঅন্দ, সফা, দিলবর, আউজ কমাল, নিগার, ওঅস্‌ল্‌, শহরী, আশীরান্‌, ঘজাল, আরবাঙ্গেজ, বহর কমাল, আসলী, ইতিদাল, গুলিস্তান, নীরিজগীর, হয়রান, জমালী, রুহ্‌ আফজা, হয়রৎ, মৎ-ই-দিল, মানওয়ী, পহ্‌লওয়ী।

ফার্সী মোকাম ও হিন্দুস্তানী রাগসমূহের মিশ্রণে যে রূপগুলি পাওয়া যায় সেগুলির উল্লেখ করা হয়েছে—

রকব্‌ ও ঘজালের মিশ্রণে খট্‌রাগ পাওয়া যায়।

বয়াৎ-এর সঙ্গে ধনাশ্রীর সাদৃশ্য বর্তমান।

হুসেনী, দুগাহ্‌ ও নওরোজ-ই-আজম্‌-এর মিশ্রণে কাফী রাগ পাওয়া যায়।

নওআ, পুরনশাক ও নিহাওঅন্দ-এর মিশ্রণে সারঙ্গ রাগ পাওয়া যায়।

গাহ্, চাহারগাহ্, মায়া, বস্তানিগার, জঙ্গুলা, মঘলুব—এই গুলির মিশ্রণে টোড়ীরাগ পাওয়া যায়।

জাবল ও মুখালিফের মিশ্রণ পূরবীর অনুরূপ।

নীরিজ-ই-সধীর ও নিরীজগীর-এর মিশ্রণে ইমনী পাওয়া যায়।

উশ্শাক, ইরাক, আউজ—এইগুলির সংমিশ্রণে গুণকলী রাগ পাওয়া যায়।

আস্থুল এবং বহর অর্থাৎ বিভিন্ন তাল সম্বন্ধীয় বর্ণনা।

পারস্য প্রভৃতি আরব বহির্ভূত অঞ্চলের সঙ্গীতে (আঘানী-ই-আজমী) সতেরটি তাল (আস্থুল) বর্তমান। এগুলিকে বহর্ এবং দায়রাও বলা হয়ে থাকে। বহরগুলির নাম—

বহর মুখম্মস

বহর তুর্কে জরব্। একে তুর্কী জরব্ও বলা হয়।

বহর দুএক।

বহর দুর

বহর সকীল

বহর খফীফ

বহর চারজরব্।

বহর দরানশাস্ত

বহর মলিতন্

বহর জরব্ অল্ফতহ্।

বহর ফাখ্তাহ্।

বহর চীজ

বহর নাম সকীল।

বহর আজফর্।

বহর আরমদ্।

বহর রমল্।

বহর হন।

দশম অধ্যায়

হিন্দুস্থানের তাল অধ্যায় (এলম্-ই-আস্থুল্)। মহাদেব এবং পার্বতী তালের প্রবর্তন করেন। মহাদেব যে নৃত্য করেছিলেন তাকে তাণ্ড্

(তাণ্ডব) বলা হয়। এই নৃত্য খুব দ্রুত বেগে এবং প্রাবল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পার্বতীর নৃত্যকে লাস্ (লাস্য) বলা হয়। এই নৃত্য কোমল, সমগতি এবং শান্তভাবাপন্ন। পরে এই তাণ্ডব এবং লাস্য নৃত্য থেকেই তালের উদ্ভব হয়। এই তাল মাত্রাসমূহের সমষ্টি। বর্তমান ভাষায় একে কলা নাম দেওয়া হয়েছে। কোন কোন তাল বিলম্বিত ছন্দে রচিত এবং কোন কোনটি লঘু, গুরু, প্লুত এইগুলির সমষ্টি। মাত্রাসমূহ বিরাম, দ্রুত এবং বিরাম ও অনুদ্রুত এইভাবে গঠিত হয়। এ সম্বন্ধে দুই রকম বিশ্বাস পোষণ করা হয়। একটি হরফসমূহের বিলম্বিত ও হ্রস্ব উচ্চারণ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্যাপারটি পিঙ্গলের ছন্দশাস্ত্র ও ছন্দ সম্বন্ধীয় বিধি অনুসারে সম্পাদিত হয়। কেবলমাত্র পিঙ্গল ও অপরাপর ছন্দশাস্ত্রেই লঘু ও গুরুর বিষয় বর্ণিত আছে। তালে সবগুলি মাত্রাই সন্নিবিষ্ট থাকে। লঘু হরফসমূহ একমাত্রা হিসাবে ধরা হয়। গুরুকে দুই মাত্রা হিসাবে ধরা হয় এবং প্লুতকে তিন মাত্রা হিসাবে ধরা হয়। দ্রুতকে লঘুর অর্ধেক হিসাবে ধরা হয়। এর পরে বিরাম, দ্রুতবিরাম, অনুদ্রুত প্রভৃতি সম্বন্ধে সংস্কৃত শাস্ত্র অনুযায়ী নির্দেশ সংক্ষেপে বলা হয়েছে।

তালকর্ম

গ্রহ চারপ্রকার।

সম, বিষম, অতীত ও অনাঘাত।

সম—সঙ্গীত, বাদ্য বা নৃত্য তাল ও মান অনুসারে ধরা হবে এবং সম্পন্ন করা হবে।

বিষম—সম-এর মত নির্দিষ্ট নয়।

অতীত—তালের পূর্বে গীত আরম্ভ হয়।

অনাঘাত—তালের পরে গীত আরম্ভ করা হয়।

তালের শেষ থেকে শুরু করাকে আচার বলা হয়। আচার থেকে গ্রহ পর্যন্ত অনুষ্ঠানকে পরণ বলা হয়।

আঘাত—তালের সঙ্গে সঙ্গীতক্রিয়া।

নৃত্য ও বাদ্য সম্পর্কীয় তথ্য

নৃত্যের কয়েকটি প্রকারভেদ আছে।

তাণ্ড্ (তাণ্ডব)—দ্রুত এবং প্রবল নৃত্য। মহাদেব এই নৃত্যানুষ্ঠান করেন।

লাস্ (লাস্য)—কোমল, সমগতিবিশিষ্ট শান্ত নৃত্য। পার্বতী এই নৃত্যানুষ্ঠান করেন।

সুধঙ্গ—এটি শান্ত এবং মধুর নৃত্য। সমতাযুক্ত নিতম্বচালনা দ্বারা এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। এর অনেকগুলি ক্রিয়া আছে। যথা, অঙ্গ, শিল্প, আরোপ, শুধ্ মুদ্রা, লাগ, ডাট প্রভৃতি।

বাদ্যের চারটি প্রকারভেদ বর্তমান।

তত বা তারের বাজনা; যথা—রবাব, তম্বুর, কানুন।

বিতত বা চামড়ার বাজনা; যথা—মৃদঙ্গ, ঢুহল, দায়েরা (Tambourine)।

ঘন বা ধাতব বাজনা; যথা—মঞ্জীরা, সিন্‌জ্ (ঝাঁঝর), ঘটসার প্রভৃতি।

সুষির (সুখর) বা ফুৎকার বাদ্য; যথা—নাই (বাঁশি), সুর্ণা (শানাই) প্রভৃতি।

তাল সম্বন্ধীয় বর্ণনা

গোকুলা (?)—দুই লঘু, এক গুরু, এক লঘু ও এক প্লুত। সর্বসমেত আট মাত্রা।

রাজবিদ্যাধর—দুই লঘু, এক গুরু, দুই দ্রুত। পাঁচ মাত্রা।

জিম্মক—দুই লঘু, এক গুরু, দুই লঘু, এক গুরু। আট মাত্রা।

তিলকামোদ—দুই লঘু, চার দ্রুত। চার মাত্রা।

বিজয়ানন্দ—দুই লঘু, তিন গুরু। আট মাত্রা।

ক্রীড়া—একটি বিরামযুক্ত দ্রুত।

জয়শ্রী—এক গুরু, এক লঘু, এক গুরু, এক লঘু, এক গুরু। আট মাত্রা।

মকরন্দ—দুই দ্রুত, তিন লঘু। চার মাত্রা।

কীরৎ (কীর্তি)—এক লঘু, এক প্লুত, এক গুরু। অতঃপর এক লঘু, এক প্লুত। দশ মাত্রা।

শ্রীকীর্তি—দুই গুরু, দুই লঘু। ছয় মাত্রা।

বদরমালী (?)—এক গুরু, চার দ্রুত, পুনরায় এক গুরু। ছয় মাত্রা।

সমতাল—এক লঘু, এক দ্রুত, এক দ্রুত। দুই মাত্রা।

•নন্দন—এক লঘু, দুই দ্রুত, এক প্লুত। পাঁচ মাত্রা।

মঠকা (মণ্ঠক)—এক গুরু, এক দ্রুত, এক প্লুত। সার্ধ পাঁচ মাত্রা।

বামণ্ঠকা—দুই লঘু, এক দ্রুত, এক দ্রুত বিরাম। তিন মাত্রা।

দীপক—দুই দ্রুত, দুই লঘু, দুই গুরু। সাত মাত্রা।

উদীক্ষণ—দুই লঘু, এক গুরু। চার মাত্রা।

ঢেঙ্কী—এক গুরু, এক লঘু, পুনরায় এক গুরু। পাঁচ মাত্রা।

বখম (বিষম)—তিন দ্রুত, এক দ্রুত বিরাম; পুনরায় তিন দ্রুত ও এক দ্রুত। চার মাত্রা।

মুল (মল্ল)—চার লঘু, এক দ্রুত বিরাম, এক দ্রুত। পাঁচ মাত্রা।

পূর্ণ কঙ্কাল—চার দ্রুত, এক গুরু, এক লঘু। পাঁচ মাত্রা।

খণ্ড কঙ্কাল—দুই গুরু, এক লঘু। পাঁচ মাত্রা।

সম কঙ্কাল—দুই গুরু, এক লঘু। পাঁচ মাত্রা।

বিষম কঙ্কাল—এক লঘু, দুই গুরু। পাঁচ মাত্রা।

আইদোয়ান (বিদ্বান)—এক দ্রুত, এক লঘু, দুই দ্রুত, এক লঘু। সার্ধ তিন মাত্রা।

চিত্র—একটি অনুদ্রুত।

জাহ্নবী—এক গুরু, তিন দ্রুত। সার্ধ তিন মাত্রা।

আভঙ্গ—এক লঘু, এক প্লুত। চার মাত্রা।

বসন্ত—তিন লঘু, তিন গুরু। নয় মাত্রা।

প্রতাপশেখর—এক প্লুত, এক দ্রুত, এক দ্রুত বিরাম। পাঁচ মাত্রা।

জয়ঝম্পা—এক গুরু, দুই দ্রুত, এক দ্রুত বিরাম। সার্ধ তিন মাত্রা।

চতুর্মুখ—এক লঘু, এক গুরু, এক লঘু ও এক প্লুত। সাত মাত্রা।

মদন—এক দ্রুত, এক গুরু। তিন মাত্রা।

রতি—এক লঘু, এক গুরু। তিন মাত্রা।

পার্বতীলোচন—তিন গুরু, এক লঘু, এক প্লুত, দুই গুরু, তিন দ্রুত। পঞ্চদশ মাত্রা।

লীলা—এক দ্রুত, এক লঘু, এক প্লুত। সার্ধ চার মাত্রা।

করণ—চার দ্রুত। দুই মাত্রা

ললিত—দুই দ্রুত, এক লঘু, এক গুরু; পুনরায় এক লঘু, এক গুরু। সাত মাত্রা।

রাজনারায়ণ—দুই দ্রুত, এক লঘু, এক গুরু; পুনরায় এক লঘু, এক গুরু। সাত মাত্রা।

লছমী—এক দ্রুত, এক দ্রুত বিরাম, এক লঘু, এক প্লুত। পাঁচ মাত্রা।

ললিতপ্রিয়—দুই লঘু, এক গুরু, এক লঘু, এক গুরু। সাত মাত্রা।

শ্রীনন্দ—এক গুরু, দুই লঘু, এক প্লুত। সাত মাত্রা।

চুনক (জনক)—চার লঘু, দুই গুরু, দুই লঘু। দশ মাত্রা।

প্রধন (বর্ধন)—দুই দ্রুত, এক প্লুত। চার মাত্রা।

রাগপ্রধান (রাগবর্ধন)—এক দ্রুত, এক দ্রুত বিরাম ; পুনরায় এক দ্রুত, এক প্লুত। সার্ধ চার মাত্রা।

খট (ষট)—ছটি দ্রুত। তিন মাত্রা।

অন্তরক্রীড়া—দুই দ্রুত, এক দ্রুত বিরাম। কিয়দধিক এক মাত্রা।

বলুকৎ (বিলোকিত)—এক গুরু, দুই দ্রুত। তিন মাত্রা।

গজ—দুই লঘু, এক লঘু বিরাম। সার্ধ তিন মাত্রা।

বরণজিৎ (বর্ণ যতি)—দুই লঘু, দুই দ্রুত। তিন মাত্রা।

হংস—দুই লঘু বিরাম। শেষটি বিরাম যুক্ত। এক মাত্রা।

করুণা—এক গুরু। দুই মাত্রা।

সারস—এক লঘু, তিন দ্রুত, দুই লঘু। সার্ধ চার মাত্রা।

চণ্ড—দুই দ্রুত, দুই লঘু। তিন মাত্রা।

চন্দ্রকলা—তিন গুরু, তিন প্লুত। পনেরো মাত্রা।

অমী (?)—এক গুরু, এক লঘু, তিন প্লুত, দুই লঘু, তিন দ্রুত। সার্ধ পঞ্চদশ মাত্রা।

স্কন্দ—এক গুরু, এক লঘু ; পুনরায় এক গুরু, দুই দ্রুত, দুই গুরু। দশ মাত্রা।

অওদ্ (অড্ড)—দুই লঘু, দুই দ্রুত ; পুনরায় দুই লঘু। পাঁচ মাত্রা।

মোহনা—দুই লঘু, দুই দ্রুত ; পুনরায় দুই লঘু, এক গুরু। সাত মাত্রা।

দ্বন্দ্ব—দুই লঘু, তিন গুরু, এক লঘু, এক প্লুত। বারো মাত্রা।

মুকুন্দ—এক লঘু, চার দ্রুত, এক গুরু। পাঁচ মাত্রা।

কোবিদ্ (কুবিন্দক)—দুই লঘু, দুই দ্রুত, এক গুরু, এক প্লুত। আট মাত্রা।

কুলধ্বিন্ (কলধ্বনি)—দুই লঘু, এক গুরু, এক প্লুত (এখানে দুই লঘু ও একটি গুরুর পরে একটি লঘু হওয়া উচিত)। আট মাত্রা।

গৌরী—পাঁচ লঘু। পাঁচ মাত্রা।

রাজ মর্গাঙ্ক (রাজমৃগাঙ্ক)—দুই দ্রুত, এক গুরু, এক লঘু। চার মাত্রা।

রাজ মার্তণ্ড—এক গুরু, এক দ্রুত (এ ক্ষেত্রেও একটি গুরুর পরে একটি লঘু আসা উচিত)। সার্ধ তিন মাত্রা।

নসঙ্ক (নিঃশঙ্ক)—এক লঘু, এক গুরু, এক প্লুত, দুই গুরু, এক লঘু, এক গুরু। তের মাত্রা।

শার্ঙ্গদেব—দুই দ্রুত, এক লঘু, এক প্লুত, দুই গুরু, এক লঘু। দশ মাত্রা।

এটি শার্ঙ্গদেব রচিত সঙ্গীতরত্নাকরের সঙ্গে মেলে না। উক্ত গ্রন্থ অনুসারে প্রথম দুটি দ্রুতের পর একটি গুরুর প্রয়োগ হবে।

একতালী—একটি দ্রুত। অর্ধ মাত্রা।

গণ্ডক—একটি দ্রুতবিরাম।

মাতবর্ত (মাত্রাবৃত্ত ?)—একটি প্লুত। তিন মাত্রা।

নিঃশঙ্কলীন—দুই প্লুত, দুই গুরু, এক লঘু। এগার মাত্রা।

বর্ণিয়া—এক লঘু, এক দ্রুত ; পুনরায় এক লঘু, দুই দ্রুত ; পুনরায় এক লঘু, তিন দ্রুত ; পুনরায় এক লঘু। সাত মাত্র।

চজ্ (?)—তিন দ্রুত, এক লঘু। আড়াই মাত্রা।

লঙ্কা—এক লঘু, এক দ্রুত বিরাম। দুই মাত্রা।

এক্ষেত্রে শেষোক্ত মাত্রা সংখ্যা দুই দ্রুত বিরাম হবে বলে মনে হয়। নতুবা দুই মাত্রা হয় না।

রূপক—এক লঘু, এক দ্রুতবিরাম। দুই মাত্রা।

এক্ষেত্রেও একটি দ্রুত যোজিত হবে নতুবা দুই মাত্রা হয় না।

অন্ত—দুই দ্রুত। এক মাত্রা।

শঙ্খ—এক লঘু, এক দ্রুত। দেড় মাত্রা।

পরৎ (প্রতি)—এক লঘু, দুই দ্রুত। দুই মাত্রা।

সঞ্জ (?)—এক দ্রুত, তিন লঘু। সার্ধ তিন মাত্রা।

সম্মুখতর—দুই লঘু, এক দ্রুতবিরাম ; পুনরায় এক দ্রুত। তিন মাত্রা।

অষ্টতালিকা—এক দ্রুত, এক লঘু। দেড় মাত্রা।

গোণ্ড—দুই লঘু, দুই দ্রুত, এক লঘু, এক গুরু। ছয় মাত্রা।

অঙ্গ—এক লঘু, এক প্লুত, দুই লঘু, এক গুরু। আট মাত্রা।

অভিনন্দ—দুই লঘু, দুই দ্রুত, এক গুরু। পাঁচ মাত্রা।

রায়বঙ্কোল—এক গুরু, এক লঘু ; পুনরায় এক লঘু, এক গুরু। ছয় মাত্রা।

গারুগী—তিন দ্রুত, এক দ্রুতবিরাম। দুই মাত্রা।

বর্ণমুখ—দুই দ্রুত, এক লঘু, পুনরায় দুই দ্রুত। তিন মাত্রা।

নান্দী—দুই লঘু, দুই দ্রুত ; পুনরায় দুই লঘু ও দুই গুরু। নয় মাত্রা।
দাবানল—এক লঘু বিরাম, এক লঘু। দুই মাত্রা।
ভখন—দুই লঘু, চার দ্রুত, তিন লঘু বিরাম। সার্ধ আট মাত্রা।
সরস্বতী আভরণ—দুই গুরু, দুই লঘু, দুই দ্রুত। সাত মাত্রা।

সমাপ্ত